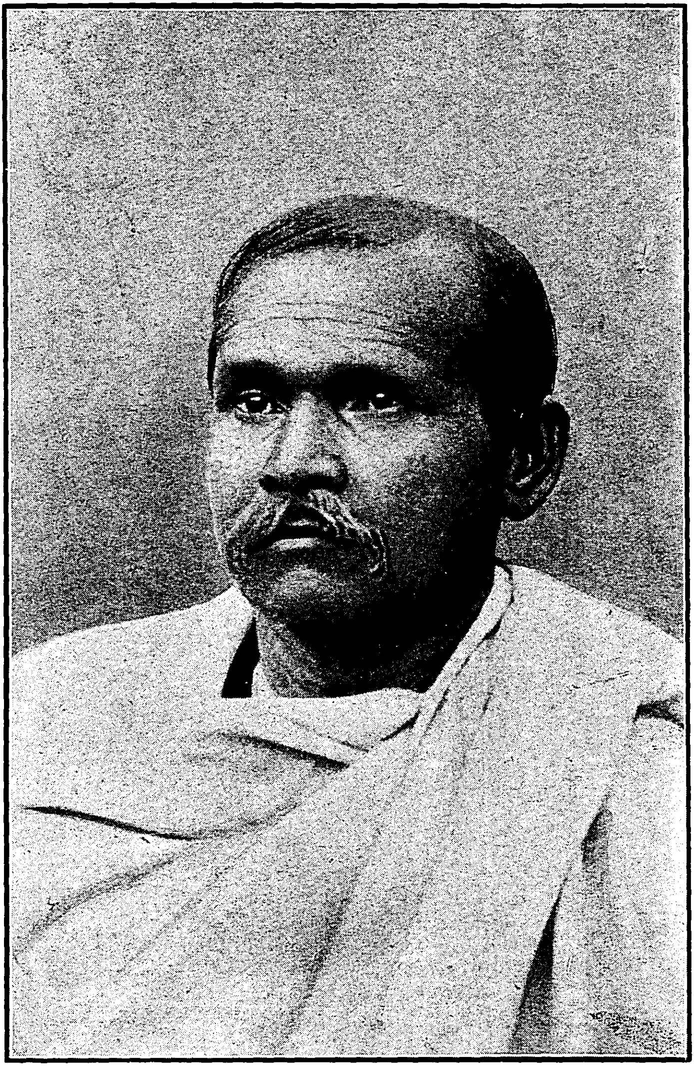


আমার জীবন কথা

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ

কলিকাতা, ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার আর্ট প্রেস হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বি, এ, দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩৩০ সাল।

ভূমিকা

বাল্যকালে কোন জ্যোতিষী আমাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এ বালক সৌভাগ্যশালী হইবে।" বস্তুতঃ ভগবানের কৃপায় আমি অতিশয় সৌভাগ্যবান হইয়াছি। যদিও আমার পার্থিব ধন সম্পদ কিছুমাত্র নাই, তথাপি আমি সৌভাগ্যশালী—কেন না আমি হরিধনে ধনী হইয়াছি, হরিকে পাইয়া আমি অনন্তকালের সম্পদ লাভ করিয়াছি। যে যুগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক ভারতে বিকীর্ণ হইতেছিল, যে যুগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া ঋষিজীবনের স্নিগ্ধজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিলেন, যে যুগে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বিধাতা পুরুষ ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, অঘোরনাথ, গৌরগোবিন্দ, ত্রৈলোক্যনাথ, কান্তিচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল ও বঙ্গচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তদল লইয়া নববিধানের নবলীলা প্রকটন পূর্ব্বক পৃথিবীময় নবজাগরণ বিধান করিতেছিলেন, সেই যুগে ভগবান আমাকে জন্মদান করিয়া পরম সৌভাগ্যবান করিয়াছেন। এই জন্য জন্মদাতা পরমেশ্বরকে আমি কৃতজ্ঞতা ভরে প্রণাম করি।

মানুষের জীবনভূমি শ্রীহরির লীলাক্ষেত্র, তাই জীবনের স্থূল ব্যাপার সকল লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ।

৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা,
আশ্বিন, ১৩৩০ সাল।

সূচীপত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার জীবন কথা।

জন্ম জানুয়ারী ১৮৫৪ — মৃত্যু ১৭ মে ১৯২৮ ।

বাল্য-জীবন

অনুমান * ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে (বাঙ্গলা পৌষ) ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার প্রায় ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী বীরসিংহ গ্রামে ঘোষ পরিবারে আমার জন্ম হয়। আমার পিতৃদেব স্বর্গগত গুরুপ্রসাদ ঘোষ, মাতৃদেবী স্বর্গীয়া কিশোরীমনি ঘোষ জায়া। পিতামহ স্বর্গীয় শিব প্রসাদ ঘোষ, পিতামহী মহামায়া দেবী, মাতামহ স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ বসু—নিবাস ছিল আটীয়ার অন্তর্গত নাগরপাড়া গ্রামে। আমার মাতৃদেবী শৈশব কালেই পিতৃ-মাতৃ-হীনা হইয়াছিলেন। সিংহরাগী নিবাসী ৺পদ্মলোচন ঘোষ আমার মাতার মাতুল। পিতা-মাতাহীনা শিশু বালিকা মাতুলালয়ে মাতামহীর আশ্রয়ে প্রতিপালিতা হন, এবং তাঁহারাই যথা সময়ে তাঁহার বিবাহ দেন। আমার পিতৃদেব বাঙ্গলা লেখা পড়া শিখিয়া জমিদারী সরকারে কর্ম্ম করিতেন এবং তাঁহারই উপার্জ্জনে বীরসিংহস্থ ঘোষ-পরিবারের দারিদ্র্য কথঞ্চিৎ মোচন হইয়াছিল। পিতৃদেবের একজন জ্যেষ্ঠ-সহোদর ভ্রাতা ও দুইজন কনিষ্ঠ খুড়তাত ভ্রাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠকে তিনি অতিশয় ভক্তি করিতেন, কনিষ্ঠ খুড়তাত ভাইদিগকেও বিলক্ষণ স্নেহ করিতেন। পিতৃদেবের জীবিত-কাল পর্য্যন্ত সকলেই একান্ন-ভুক্ত ছিলেন।

---

* আমার কোষ্ঠী পত্র নাই।

আমি পিতা মাতার প্রথম সন্তান, বিশেষতঃ পরিবারের উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির পুত্র, আমার প্রতি সকলের বিশেষ আদর যত্ন ছিল। আমার জেঠীমা আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ যত্ন করিতেন। আমিও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতাম না। তিনি পিত্রালয়ে গেলে, আমি মাকে ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতাম।

উপযুক্ত বয়সে আমার বিদ্যারম্ভ হইল; জেঠা ও খুড়া মহাশয়দের নিকট গ্রাম্য বাঙ্গলা লেখা পড়া শিক্ষা হইতে লাগিল। ১০।১১ বৎসর বয়সে একবার বিদ্যাশিক্ষার্থ ময়মনসিংহ নগরে প্রেরিত হই, কিন্তু বাড়ীর প্রতি একান্ত মমতা বশতঃ তথায় আমার মন টেকে নাই, সুতরাং বাড়ী চলিয়া আসি। পরে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামে বাঙ্গলা স্কুলে কিছু দিন পাঠ করি। অধিকাংশ সময় বাড়ীতেই যাপন করি। পৌত্তলিক পরিবারে জন্মিয়া বাল্যকাল হইতে পুত্তলে বিশ্বাসী ছিলাম। দেব দেবীর মূর্ত্তিকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতাম। একখানি ক্ষুদ্র চৌচালা ঘরে পূজার পরিত্যক্ত মূর্ত্তি বিশেষকে স্থাপন করিতাম এবং ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া ফুল বেলপাতা সহযোগে তাহার পূজা করিতাম। কখনো সঙ্গী ছেলেমেয়েদিগকে ডাকিয়া পূজার ঘটা করিতাম। কদলী বৃক্ষকে মহিষ ও কচু গাছকে পাঁঠা-রূপে বলিদান করিতাম। চড়ক পূজাও করিয়াছি, একবার চড়কে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া যাই, এবং পা ভাঙ্গিয়া অনেক দিন ক্লেশ পাই।

আমরা ছয় ভাই বোন। আমি প্রথম, দ্বিতীয়া বামাসুন্দরী, তৃতীয় নীলকণ্ঠ, চতুর্থা রাইসুন্দরী, পঞ্চমা প্যারীসুন্দরী, ষষ্ঠ যোগেন্দ্র নারায়ণ।

অনুমান চৌদ্দ বৎসর বয়সে আমি ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে প্রবেশ করি। ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেই লোকে বলিত "তুমি খৃষ্টান হইয়া যাইবে।" বাড়ী গেলে পিতৃদেব এ বিষয়ে সাবধান

করিতেন। আমিও খুব দৃঢ়তা সহকারে বলিতাম "না, আমি কখনও খৃষ্টান হইব না।" তখন ব্রাহ্মদিগকে আমাদের দেশী গ্রাম্য লোকেরা খৃষ্টান বলিত।

যৌবন কাল

ধর্ম্মজীবনের সূচনা

১৮৬৯ খৃঃ অঃ ময়মনসিংহ নগরে ৺রামসুন্দর বিশ্বাস নামক এক জন অতিশয় নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু আত্মীয়ের বাসায় অবস্থিতি করি। তিনি পরম বৈষ্ণব ব্যক্তি, অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া পূজা আহ্নিক করিতেন। আমি অতিশয় গোঁড়ামীর সহিত তুলসীতলায় প্রণামাদি করিতাম। বিশ্বাস মহাশয় আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। সেই গৃহে আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক ঈশ্বরচন্দ্র বসু নামক একটী ছাত্র ছিলেন। তিনি পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করিতেন না, ব্রাহ্মধর্ম্মে মত-গত বিশ্বাসী ছিলেন। লীলাময় হরি তাঁহারই ভিতরে বসিয়া আমার কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্তঃকরণে পরিবর্ত্তন আনয়নের উদ্যোগ করিলেন। আমরা পালাক্রমে রান্না করিতাম। রান্না ঘরই আমাদের তর্ক বিতর্কের একটা স্থান হইল। তিনি পৌত্তলিকতার অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতেন; আমি তাহার প্রতিপক্ষে জবাব কাটিতাম। কিন্তু তর্কে হারিয়া যাইতাম, তাঁর যুক্তি শুনিতে চাহিতাম না, অবশেষে কাণে হাত দিতাম। তিনি কিন্তু তাহাতে ছাড়িতেন না, আরো জেদ করিয়া তর্ক করিতেন। যেন কোনো অদম্য শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি আমার সঙ্গে প্রসঙ্গ করিতেন; সেই বন্ধুটী আমার পক্ষে ভগবানের বিশেষ দান। ভগবান আমার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে আশ্চর্য্যরূপে

ব্যবহার করিলেন। যখন পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাস হইল তখন নিরাকার ঈশ্বরের দিকে অন্তরে এক প্রকার অপরিস্ফুট টান পড়িল। সেই বন্ধুই ব্রাহ্মসমাজে যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যাইতে আমার সাহস হয় নাই। আমি প্রথম দিন একাকী ব্রাহ্মসমাজে গমন করি। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসায় ব্রাহ্মসমাজের একখানি গৃহ ছিল, সেখানেই সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা হইত। এক্ষণ যে স্থানে মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের রাজপ্রাসাদ তাহারই পশ্চিম দিকে সে গৃহ ছিল। প্রথম দিন উপাসনা গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হয় নাই, বাহিরে দাঁড়াইয়া সঙ্গীত প্রার্থনাদি শ্রবণ করিলাম। দ্বিতীয় রবিবারও বাহিরে দাঁড়াইয়া উপাসনা শুনিতেছি, এমন সময়ে জেলা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীকুমার গুহ মহাশয় আমাকে ভিতরে যাইয়া বসিতে বলিলেন, আমি নিঃশঙ্ক মনে ভিতরে যাইয়া বসিলাম। উপাসনা বড় কিছু বুঝিলাম না, সঙ্গীতাদি বেশ লাগিল। শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ময়মনসিংহ ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। দুই এক দিন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে দেখিয়া বাবু শ্রীনাথ চন্দ আমার একজন সহপাঠীযোগে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কোনও কোনও পুস্তক আমাকে পাঠাইয়া দেন। "পৌত্তলিক প্রবোধ" এবং "ধর্ম্মশিক্ষা" নামক দুইখানা পুস্তক পাঠে আমার বড়ই উপকার হইল। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার বিবরণ সম্বলিত "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা কোনও বন্ধু আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। ব্রহ্মোৎসবের বিবরণ পাঠে মনে বড় আশা ও উৎসাহ হইয়াছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও পূজার ছুটীতে বাড়ী গেলাম। বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। এবার প্রতিমা প্রণাম করি নাই।

পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করি না, প্রতিমা প্রণাম করিয়া কপট ব্যবহার করা অন্যায় মনে লইল। নবমী পূজার দিন পুষ্পাঞ্জলী দিবার জন্য আহুত হইলাম, কিন্তু আমি গেলাম না। তখন আমাদের একটী পুরাতন ভৃত্য জোর করিয়া আমাকে প্রতিমার সমক্ষে লইয়া গেল এবং ঘাড়ে ধরিয়া মাথা নোয়াইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম "আমি প্রণাম করিলাম না।" তাই লইয়া বাড়ীতে একটা ভারি গোলমাল বাধিয়া গেল। কেহ কেহ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে এ ছোক্‌রা খৃষ্টান হইয়া যাইবে।

১৮৬৯ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহ নগরে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতা হইতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় প্রভৃতি এক বৃহৎ দল আগমন করেন। উৎসবের দিন প্রাতঃকালে উক্ত মহাশয়দ্বয় উপাসনা ও উপদেশ দান করেন। তাঁহাদের দিকে উন্মীলিত-নয়নে তাকাইয়া আমার মনে হইল যেন এক নিরাকার দেবতা আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের মুখে কথা বলিতেছেন। তখনও আমি ব্রহ্মোপলব্ধি ইত্যাদি কিছুই জানি না। কোনো অদৃশ্য-শক্তি-প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করি, কিন্তু কীর্ত্তন উপাসনাদি সকলই লাগে ভাল। উক্ত মহাশয়দের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গ করিতে বাসনা হইয়াছিল, সাহসে কুলাইল না। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় হইল না।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা হইত। আমি এই সময় হইতে নিয়মিতরূপে সেই উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিলাম। "সঞ্জীবনীর" সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র, তিনি প্রাতঃকালে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। বিদ্যালয়ে ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় "চারুপাঠ" প্রথম ভাগ ইত্যাদি বই আমাদিগকে পড়াইতেন।

তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা ও উপদেশ করিতেন তদ্দ্বারা আমার মন ঈশ্বরের দিকে উন্মুখী হইতে লাগিল। তাঁহার কথা শুনিবার আগ্রহ বাড়িতে লাগিল, প্রতীক্ষা করিতাম কখন পণ্ডিত মহাশয়ের ঘণ্টা আসিবে। বস্তুতঃ আমারই জন্য ভগবান তাঁহাকে বিদ্যালয়ে রাখিয়া এরূপ শিক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহার তাৎকালিক উপদেশাদি আমার জীবনে ভগবানের বিশেষ দান। তাঁহার বাসায় যাইয়া তাঁহার সঙ্গে প্রসঙ্গাদি করিতে তেমন সাহস হইত না, কিন্তু স্কুলে খুব অন্তর ভরিয়া তাঁর কথা শুনিতাম ও তৃপ্ত হইতাম।

ক্রমে মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার সময় সমাগত হইল। সরস্বতীকে প্রণাম করি নাই বলিয়া বাসার অভিভাবক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন ও ভর্ৎসনা করিলেন। সেই দিন হইতে আমাকে রান্না করিতে নিষেধ করা হইল। সেই নিষ্ঠাবান হিন্দু আত্মীয় তাঁহার খাদ্য সামগ্রী আর আমায় স্পর্শ করিতে দিতেন না। তখন গোপনে গোপনে লুকাইয়া সামাজিক ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান করি, অভিভাবক মহাশয় তাহা ভাল জানিতেন না।

একবার বন্ধের সময় বাড়ী গেলাম। একদিন বাড়ীতে আমাদের মণ্ডপ ঘরের বারান্দায় সায়ংকালে একখানি ছোট চৌকিতে উপবিষ্ট হইয়াছি। প্রাণটা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। এক অপূর্ব্ব ব্রহ্ম আবির্ভাবের মধ্যে প্রাণ ডুবিয়া গেল। আনন্দময় দেবতা আমার চিত্তকে তাঁহার আনন্দরসে অভিষিক্ত করিলেন। এমন সুন্দর রূপ আর পূর্ব্বে দেখি নাই; এই প্রথম ব্রহ্ম পরিচয়।

১৮৭০ খ্রীঃ অঃ জুন মাসে গ্রীষ্মের ছুটীর পরে বাড়ী হইতে ময়মনসিংহে আসিলাম। তখন ঢাকা হইতে বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় তথায় আগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গবাবু তখনও ঢাকাতে শিক্ষকতা করিতেন, অবকাশ সময়ে নানা স্থানে প্রচার কার্য্য করিতে যাইতেন। তিনি যে

কয়দিন এখানে ছিলেন, প্রায় প্রতিদিন সায়ংকালে গিরিশ বাবু মহাশয়ের বাসায় ধর্ম্ম প্রসঙ্গ ও প্রার্থনাদি হইত, আমি নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিতাম। প্রতিদিন রাত্রি ১১।১২টা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিয়া বাসায় যাইয়া কোনও দিন খাইতে পাইতাম, কখন পান্তভাত খাইতাম, কখনও কিছুই খাইতে পাইতাম না, অনাহারে রাত্রি কাটিয়া যাইত। এই সংবাদ বঙ্গবাবু ও গিরিশ বাবু শুনিয়া আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে রাত্রিতে খাওয়াইতেন। তাঁহাদের এই সদয় ব্যবহারে আমি অতিশয় কৃতার্থ বোধ করিলাম।

এই সময়ে প্রার্থনা করিয়া সান্ত্বনা ও অন্তরে কিছু কিছু বল পাইতে লাগিলাম। প্রকাশ্যরূপে ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান ও ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিলিতে লাগিলাম। তখন ব্রাহ্মদের পরস্পরের প্রতি অপূর্ব্ব প্রেম ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এই সময়ে শাখা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব হইল, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন, মধুসূদন সেন এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি দীক্ষিত হইলেন। ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিশামিশি করিতে দেখিয়া বাসার অভিভাবক মহাশয় বড়ই বিরক্ত হইলেন। সমাজ হইতে বাড়ী আসিলেই নানারূপ ভৎর্সনা করিতেন। কখনও বাসা হইতে বাহির করিয়া দিতে চাহিতেন। আমার পিতৃদেবকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন, "আপনার পুত্র ব্রাহ্ম হইয়াছে, যদি তাহাকে রক্ষা করিতে চান, তবে শীঘ্র তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইবেন ; আমি নানারূপ শাসন করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না" ইত্যাদি। পিতা আমাকে বাড়ী যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন, আমার মাতৃদেবীর গুরুতর পীড়া হইয়াছে, তিনি আমাকে দেখিতে চাহেন ইত্যাদি হেতুবাদের কথা লিখিলেন। আমার সে কথায় বিশ্বাস হইল না। সুতরাং আমি আর বাড়ী গেলাম না। তিনিও আর পীড়াপীড়ি করিলেন না, মনে ভাবিলেন, পূজার ছুটীতে যখন বাড়ী যাইব তখন আমাকে বন্দী করিবেন।

দীক্ষা এবং পরীক্ষা

আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত প্রায় মাসাধিককাল ময়মনসিংহে বাস করেন। তাঁহার সহযোগে ভগবান আমার জীবনে এক গুরুতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন। এ সময় প্রতিদিন প্রাতে উপাসনা ও সায়ংকালে ধর্ম্মালোচনা হইত। তিনি যেমন জীবন্তভাবে উপাসনা ও আলোচনা করিয়াছিলেন, তদ্বারা আমাদের অনেকের জীবন পরিবর্ত্তিত হইল। নিরাকার ঈশ্বর-উপলব্ধি ইত্যাদি বিষয় আমাদের অনেকের নিকট একরূপ শুনা কথা ছিল, কিন্তু এই সাধু পুরুষের জীবনে ঈশ্বরের জীবন্ত প্রকাশ অনুভব করিয়া আমাদের আত্মাতে যথার্থ ঈশ্বর লিপ্সা উদ্দীপ্ত হইল। ধর্ম্মজীবনের যে সকল গুরুতর বিষয় আলোচনা হইয়াছিল, আমার সঙ্কলিত "ধর্ম্মসোপান" নামক পুস্তকে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপরে উহা সাধু অঘোরনাথের জীবন চরিত পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ময়মনসিংহের ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মজীবনের নূতন আলোক লাভ করিয়া নব উদ্যমে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগে লালায়িত হইলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর উৎসব হইল, সাধু অঘোরনাথ সমস্ত দিন উপাসনা আলোচনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। ভগবানের বিশেষ কৃপা সম্ভোগ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। ৺কালীকুমার বসু, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, এবং ৺শরচ্চন্দ্র রায় প্রভৃতি আমরা সাত জন সেই দিন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম। তৎপর আর অধিককাল হিন্দু অভিভাবক আমাকে তাঁহার গৃহে রাখিতে পারিলেন না, কয়েক দিন ঘরের বাহিরে ভাত খাইতে দিতেন এবং আমাকে স্বহস্তে থালা ইত্যাদি ধৌত করিতে হইত, কখনও দুর্ব্বাক্য বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিতেন। ভগবানের কৃপায় সকল অপমানই নিঃশব্দে সহিতে পারিতাম, হিন্দু

আত্মীয়ের উপর বিরক্তির ভাব আসিত না কিম্বা মনও দুর্ব্বল হইত না, বরং উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত।

হিন্দু সমাজ হইতে তাড়িত হইয়া কয়েকদিন ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভ্য ৺কালীকুমার বসুর গৃহে বাস করি। তৎপর বৎসরাধিককাল শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের বাসায় থাকি। তিনি অতিশয় স্নেহের সহিত আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

এবার পূজার ছুটীর প্রারম্ভে বাড়ী যাই নাই। পিতৃদেব আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য আমার দাদা ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দাদা অনেক চেষ্টা করিয়াও আমাকে বাড়ী লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।

সাধু অঘোরনাথ ও গিরিশ বাবুর সঙ্গে আমি ঢাকায় চলিয়া গেলাম। তখন রেলওয়ে হয় নাই, আমরা নৌকায় দুই তিন দিনে ঢাকা পৌঁছিলাম। পথে আমার ভয়ানক জ্বর ও অতিসার হইল। সাধু অঘোরনাথ আমার বিলক্ষণ সেবা শুশ্রূষা করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলাম। সাধু অঘোরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতি একদল ব্রাহ্ম ঢাকা জেলার ভাটপাড়া প্রভৃতি গ্রামে প্রচারার্থ গমন করেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে যাই। ভাট-পাড়ায় শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে কয়েকদিন ব্রহ্মোৎসব হইল। তৎপর আমরা আমদিয়া গ্রামে গমন করি। সে গ্রামে যাহাতে ব্রহ্মসংকীর্ত্তনাদি না হইতে পারে তজ্জন্য গ্রামের লোকেরা বদ্ধপরিকর হইল। আমরা কীর্ত্তন করিতে করিতে যে দিকেই যাইতে চাই সেই দিকেই লোকে বাঁশ পুঁতিয়া পথ বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। সুতরাং আমরা নৌকায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। সেখানে আসিয়া দেখি নৌকার ধারে গ্রামের বালক বালিকাদিগকে আনিয়া মল মূত্র ত্যাগ করাইয়া স্থানটী বিষ্ঠাময় করা

হইয়াছে, একটু স্থানে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করিবারও সাধ্য নাই। নৌকা অপর এক স্থানে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে একটী বয়স্কা বিধবা-ভদ্র-কন্যা নৌকাতে কর্দ্দম ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন, গ্রামের লোকেরা ইষ্টক ছুঁড়িতে লাগিল। আমরা ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম।

আমি ময়মনসিংহ হইতে ঢাকা চলিয়া গেলে আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমার উদ্দেশে ময়মনসিংহে আসিয়াছিলেন। আমি ঢাকা চলিয়া গিয়াছি শ্রবণ করিয়া তিনি একান্ত শোকাকুল হইয়া মূর্চ্ছিত প্রায় ভূপতিত হইলেন। শ্রদ্ধেয় গোপীবাবু মহাশয় নানা রূপ সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ দান করিলেন এবং ফিরিয়া আসিলেই আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন।

ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমি বাড়ী চলিলাম। পথে ময়মনসিংহের প্রায় ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী গাবতলী নামক স্থানে বন্ধুবর শ্রীনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তিনি বাড়ী হইতে ফিরিয়া ময়মনসিংহে চলিয়াছেন। এ অপ্রত্যাশিত বন্ধু-সম্মিলনে ভগবানের বিশেষ করুণা ও কৌশল প্রকাশ পাইল। শ্রীনাথ আমাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি আমার সঙ্গে চলিলেন। সে যাত্রায় আমার জন্য তাঁর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন ছিল, তাহা তিনিও জানিতেন না, আমিও জানিতাম না। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সকলই জানেন। যিনি মাতৃগর্ভস্থ শিশুর পানের জন্য অগ্রেই মাতৃবক্ষে দুগ্ধ-সঞ্চারের ব্যবস্থা করেন তিনি আমার ধর্ম্ম জীবনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনায় বিধাতার লীলা প্রকাশ পাইবে।

আমরা প্রথমতঃ পিতার কর্ম্মস্থল মধুপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। পিতা আমাকে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন—যেন হারা-ধন পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। পিতৃদেবকে আমি গোপনে বলিলাম যে

'আমি জাতিভেদ ত্যাগ করিয়াছি, আমাকে লইয়া আহারাদি করিলে আপনার কোনরূপ সামাজিক গোলে পড়িবার সম্ভাবনা, অতএব আমাকে ভিন্ন ঘরে খাইতে দিলেই ভাল।' তিনি বলিলেন, 'সে ভাবনায় তোমার কাজ নাই, তুমি এ বিষয় কাহাকেও কিছু বলিও না।' আমি বলিলাম 'আমি আপনা হইতে উপযাচক হইয়া অবশ্য কিছু বলিব না। কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা বলিতে পারিব না।' এ সকল কথার পরেও তিনি আমাকে লইয়া আহারাদি করিলেন। তৎপর আমাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন এবং বাড়ীতে চিঠি লিখিলেন যে তিনি স্বয়ং যে কয়দিন বাড়ী না যাইতে পারেন তাবৎ যেন আমাকে ভিন্ন ঘরে খাইতে দেওয়া হয়।

রীতিমত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই প্রথম বাড়ী আসিয়াছি। স্নেহময়ী জননী কান্দিয়া আকুল, আত্মীয় স্বজনেরা কেহ প্রবুদ্ধ করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন, কেহ ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। পিতৃদেব বাড়ী আসিলেই পরীক্ষা-তুফান ঘনঘটা করিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন কেবল ভগবান ভরসা, সজনে নির্জ্জনে অন্তরে অন্তরে কেবল তাঁর নিকট প্রার্থনা করিতাম ও তাঁর চরণ জড়াইয়া ধরিতাম। অতি কাতরে প্রভুর চরণে বল ভিক্ষা করিতাম যেন সে বিপদে রক্ষা পাইতে পারি। পিতা কখনও তিরস্কার করিতেন, কখনও ভয় প্রদর্শন করিতেন, কখনও প্রহার করিতে উদ্যত হইতেন। সে সকলকে ভয় হইত না, কিন্তু যখন মা আমাকে সম্মুখে লইয়া নানাবিধ বিলাপ ধ্বনি করিয়া ক্রন্দন করিতেন, তখনই বড় বিপদ বোধ করিতাম। তৎকালে একান্তমনে করজোড়ে ভগবানের শরণ লইতাম, তিনি প্রাণে অবতরণ পূর্ব্বক অপরাজিত শক্তি সঞ্চার করিতেন। ভগবানের প্রকাশে প্রাণ মন এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে নিমগ্ন হইত। দেহ মনের ভাবান্তর দেখিয়া

মা ক্রন্দনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া একটু ভয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন, 'বাবা তুই এমন করিস্ কেন, তোর কি হইল ?' ইত্যাদি।

একদিন মা বলিলেন 'তুই প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।' আমি বলিলাম 'আমিও তোমার সঙ্গে উপবাসী থাকিব।' বেলা দুপুর হইয়া গেল, স্তন্যপায়ী শিশু স্তন্য পান না করিলে যেমন মায়ের স্তনে বেদনা অনুভূত হয়, আমার স্নেহময়ী মাতার বক্ষ যেন তেমনি বেদনাযুক্ত হইল ; মা বারম্বার আমাকে খাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি দুষ্ট ছেলে, জেদ করিতে লাগিলাম 'তুমি যদি খাও আমিও খাইব।' মায়ের কোমল প্রাণ ক্রমে অধিকতর বেদনাযুক্ত হইল, সন্তানবাৎসল্যের জয় হইল, মা খাইতে সম্মত হইলেন, আমিও আহার করিলাম।

আমি ব্রাহ্ম হইয়াছি শুনিয়া আমাকে দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে লোক সকল আসিত। তাহারা হয়ত মনে ভাবিত আমি একটা কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার হইয়াছি, অনেকেই এক একবার আসিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া যাইত।

আমি মূর্খ অজ্ঞানী দুর্ব্বল পাপী, করুণাময় পরমেশ্বর আমার উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়া আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে বলবিধান করিয়াছেন। তিনি সেই ঘোরতর পরীক্ষার মধ্যে রক্ষা না করিলে সহজে চিত্তদৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইত।

পিতৃদেব সঙ্কল্প করিলেন আমাকে আর বাড়ী হইতে স্থানান্তরে যাইতে দিবেন না, বাড়ীতেই বসাইয়া রাখিবেন। আমার অন্তরেও ভগবান বুদ্ধি যোগাইলেন। বিদ্যালয়ের ছুটীর সময় ক্রমে শেষ হইয়া আসিল। আমি মনে মনে একটা দিন স্থির করিলাম, সেইদিন বাড়ী হইতে ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা করিব একথাও কাহারো কাহারো নিকট প্রকাশ করিলাম। তৎশ্রবণে পিতৃদেব আমার শয়ন গৃহে দুইজন

পাহারা নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী ঘরের বারাণ্ডায় তিনি স্বয়ং শয়ন করিতেন। তখন কার্ত্তিক মাস, আমাদের গ্রামের চতুর্দ্দিক জলাকীর্ণ, নৌকা ব্যতীত চলাচল দুঃসাধ্য। গ্রাম দেশের পথও আমার ভাল পরিচিত নহে। পলায়ন ভিন্ন গৃহ-ত্যাগের উপায়ান্তর নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনে নিশীথকালে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পরমদেবের শরণাপন্ন হইলাম, তিনি আত্মাতে দুর্জ্জয় বল ও উৎসাহ সঞ্চার করিলেন। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে যাত্রা গান হইতেছিল, পাহারাওয়ালারা তথায় যাত্রা শুনিতে গিয়াছে। সেই অবসরে শ্রীনাথ বাবু আর আমি প্রভুর চরণ জড়াইয়া ধরিয়া পরিধেয় বস্ত্র মাত্র কোমরে বাঁধিয়া যাত্রা করিলাম। পিতৃদেবের নিকট দিয়াই বাহির হইলাম, কিন্তু তিনি নিদ্রিত ছিলেন, জানিতে পারিলেন না। আমাদের বাড়ীর পশ্চাৎভাগে এক বিল ছিল, বিলের মধ্যে ধানক্ষেত। সেই ধানবনের ভিতর দিয়া চলিলাম। এক এক স্থানে বুক-জল গলা-জল দিয়া চলিতে লাগিলাম। বহুক্ষণে বিল অতিক্রম করিলাম। অন্ধকার রজনী, অল্প অল্প শীত। অপথে ধানবনের ভিতর দিয়া ত্রস্তে ব্যস্তে পথ চলিলাম। কিন্তু প্রভুর আশ্রয়ে অন্তর ভয়শূন্য। যে পথে ময়মনসিংহে যাইতে হয় তাহার বিপরীত পথে গমন করিলাম। সন্তোষ যাইয়া কোনও সুযোগে ময়মনসিংহে আসিব এই মনে করিয়া সেই দিকে গেলাম। তখন টাঙ্গাইল মহকুমার স্থান মনোনীত করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অশ্বযোগে তথায় গমন করিবেন বলিয়া তাঁহার পথ-নির্দ্দেশক কদলী বৃক্ষ সকল কতক দূরে দূরে রোপিত হইয়াছিল। সে সময়ে আমাদের অঞ্চলে ভাল রাজপথসকল নির্ম্মিত হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের পথ প্রদর্শক কলাগাছ পোতার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, প্রায় তিন মাইল পথ চলিয়া ঐরূপ কলাগাছ দেখিতে পাইলাম। তখন ভগবান অন্তরে বুঝিতে দিলেন যে

"তোমারই পথ প্রদর্শনার্থ এসকল কলাগাছ প্রদত্ত হইয়াছে।" ভগবানের সেই আশ্চর্য্য কৌশল ও কৃপার কথা প্রসঙ্গ করিতে করিতে আমরা পূর্ব্বের ক্লেশ সমুদয় ভুলিয়া গেলাম। সেরূপ পথ-চিহ্ন না পাইলে হয়ত অন্ধকার রজনীতে আমাদিগকে নিতান্ত বিপন্ন হইতে হইত। প্রায় দশ এগার মাইল পথ চলিয়া গেলে রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা দশটার সময় আমরা সন্তোষ পৌঁছিলাম। তৎকালে বাবু তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলের হেডমাষ্টার। আমরা তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তারক বাবু অতিশয় ভালবাসা ও যত্ন সহকারে আমাদিগকে রাখিলেন। সমস্ত রাত্রি জল জঙ্গল পাঁক কাদা ভাঙ্গিয়া সন্তোষ আসিয়াই প্রিয়তম শ্রীনাথের বিলক্ষণ জ্বর হইল। তাঁহার জ্বর সারিলে কয়েকদিন পরে ময়মনসিংহের ব্রাহ্মবন্ধু আনন্দনাথ ঘোষের সঙ্গে ময়মনসিংহে উপনীত হই।

ওদিকে বাড়ীতে প্রাতঃকালে মশারী তুলিয়া আমাদিগকে না দেখিয়া মহা কান্নারোল আরম্ভ হইল। নশীরাবাদের (ময়মনসিংহ) দিকে অশ্বারোহণে লোক প্রেরিত হইল, চতুর্দ্দিকে আমাদের তল্লাশে লোকসকল ছুটিল, কেহ কোথাও আমাদের সন্ধান পাইল না। পিতৃদেব বড় মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইলেন।

পিতৃবিয়োগ

ইহার প্রায় এক মাস পরে পিতৃদেব পার্শ্ব বেদনায় পীড়িত হন। হাতুড়ে কবিরাজ তাঁহাকে জোলাপের ঔষধ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু কোনরূপে দাস্ত বন্ধ করিতে পারিল না, তাহাতেই তাঁর দেহ পাত হইল। এই নিদারুণ শোক সংবাদ পাইয়া আমার দেহে এক প্রকার কম্প উপস্থিত হইল। বাহিরে চক্ষুর জল পড়িল না, কিন্তু মনে হইতে লাগিল যেন হৃদয়ের এক দিক ভাঙ্গিয়া গেল। এই

আমার প্রথম শোক। বাড়ী যাইবার জন্য চিঠি আসিল, কিন্তু একাকী যাইতে সাহস হইল না। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শরচ্চন্দ্র রায় আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তখন ব্রাহ্মসমাজে শোকচিহ্ন ধারণের কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আমি মধ্যাহ্নে ভাতে ভাত ও দুগ্ধ আহার করিতাম, রাত্রিতে ফল মূল খাইতাম। শরৎবাবুকে লইয়া বাড়ী গেলাম। বাড়ী পৌঁছা মাত্র মা ভাই বোন প্রভৃতি আত্মীয়গণ ভয়ানক উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। ভীষণ কান্নারোলের মধ্যে আমি বসিয়া পড়িলাম এবং অবনত মস্তকে সম্মুখস্থ ভগবানের পানে তাকাইতে লাগিলাম। তিনি আমার সম্মুখে প্রকাশিত থাকিয়া মনকে এমন ভাবে রক্ষা করিলেন যে সেই মহাক্রন্দন ও বিলাপধ্বনি আমার অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারিল না— সে কান্নারোল আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়া কোন অর্থ বোধ করাইতে পারিল না। দুই তিন ঘণ্টা পরে কান্না কথঞ্চিত প্রশমিত হইল, তাকাইয়া দেখি ভগ্নী ও অপরেরা ধরাশায়ী হইয়া কান্দিতেছেন। আমার দুঃখিনী মা ঘরের পিছনে বসিয়া নয়ন জলে বসুন্ধরাকে সিক্ত করিতেছেন। আমি তাঁহার সম্মুখে যাইয়া মা মা করিয়া ডাকিলাম, কিন্তু তাঁহার অবস্থা দর্শনে আমার বাক্ রোধ হইয়া গেল।

পরিশেষে স্নানাদি করিয়া উপাসনা করিলাম। মা আমার জন্য যথারীতি হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিলেন। আমাদের দেশে আলুনী হবিষ্যান্ন করিবার প্রথা, কিন্তু আমি একটু লবণ যোগ করিয়া লইতাম। আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রাদ্ধের অধিকারী। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার জন্য সকলেই আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বাড়ীতেই শ্রাদ্ধ করিতে চাহিলাম, কিন্তু বাড়ীর অভিভাবকগণ সম্মত হইলেন না। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে আমি কোনও মতে প্রায়শ্চিত্ত করিব না, তখন

আমাকে বিদায় দিলেন। এবারে মাতৃদেবী ও আত্মীয়বর্গ শেষ চেষ্টা করিলেন, সে কাহিনী অধিক লেখা বাহুল্য ভয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

ময়মনসিংহে আসিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের বাসায় শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিতে উদ্যোগ করিলাম। তাঁহার পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী খুড়ি ঠাকুরাণী যাহাতে সে বাসায় ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ করিতে না পারি তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধের দিন প্রাতে মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, উপাসনা আরম্ভ হইলে তিনি ঘরে আগুণ দিবেন। সে দিন তিনি এত ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন যে আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন প্রয়োজন বশতঃ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ মাত্র তাঁহাকে ঝাঁটা প্রহার করিলেন। কিন্তু উপাসনার সময় আর কোন গোল করেন নাই।

ব্রাহ্ম মতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, গরীব দুঃখীদিগকে কিঞ্চিৎ চাউল ও বস্ত্র দান করা হইল। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ সকলেই উপাসনায় যোগদান করিলেন। সায়ংকালে কীর্ত্তন হইল।

মাঘোৎসবে কলিকাতা গমন

১৮৭১ খৃঃ অঃ জানুয়ারী মাসে কলিকাতা মহানগরীতে মাঘোৎসব সম্ভোগ করিবার জন্য বড় আকাঙ্ক্ষা হইল। আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র, বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে কোনরূপে প্রয়োজনীয় ব্যয়াদি নির্ব্বাহ হয়, কলিকাতা যাইবার ব্যয় কে বহন করিবে? বন্ধুদের নিকট সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহারা কেহ কেহ কিছু সাহায্য করিলেন। এইরূপে ভগবান তাঁহার দীন সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। মহানগরীর মাঘোৎসবের মহাব্যাপার সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলাম।

কলিকাতা যাইবার পথে ঢাকা নগরে পৌছিলে উৎসবে যাত্রীর দল

বারজন হইল। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় ও গুরুপ্রসাদ ভৌমিক প্রভৃতিও এই দলভুক্ত ছিলেন। ঢাকা হইতে যাত্রার পূর্ব্বদিন বৈকালে জনৈক ব্রাহ্ম ষ্টীমার আফিসে বার খানা টিকেট ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় টিকেটগুলি পকেট্ হইতে রাস্তায় পড়িয়া যায়। অনেক অনুসন্ধানেও তাহা পাওয়া গেল না। এক নূতন রকমের পরীক্ষা উপস্থিত হইল, পুনরায় টিকেট ক্রয় করিবার উপযোগী টাকাও নাই। ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া পরদিন প্রত্যুষে জাহাজে উঠিলাম। তাহার অল্পক্ষণ পরেই একটী লোক হারাণ টিকেটগুলি লইয়া জাহাজে উপস্থিত, তাহাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিয়া টিকেটগুলি লওয়া গেল। আমাদের মনে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নে কৃতজ্ঞতার সহিত ব্রহ্মোপাসনা হইল। জাহাজ দুই দিনে গোয়ালন্দে উপস্থিত হইল। কলিকাতায় ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহসাধক-দিগের চরণ দর্শনে এবং তাঁহাদের সঙ্গে উপাসনা ও উৎসব সম্ভোগে কৃতার্থ হইলাম। সকলই আমার কাছে নূতন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরের বেদীতে একদিন মহর্ষিদেবের উপাসনায় যোগ দিবার সৌভাগ্য হইল।

পরীক্ষা।

কলিকাতা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গোপীবাবুর বাসায় রহিলাম। তাঁহার পরিবারের বিশেষতঃ তাঁহার খুড়িঠাকুরাণীর একান্ত ইচ্ছা যে আমি সেখানে না থাকি। আমি সে বাসায় থাকিলে তাঁহারা গোপীবাবুকে হিন্দু সমাজে রাখিতে পারিবেন না এই ভয়ে অতিশয় ভীত হইলেন। আমাকে তাড়াইবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। আমাদের হেডমাষ্টার প্রভৃতি গুরুজনদের দ্বারা আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি সকলকেই বলিতাম যে "গোপীবাবু আমায় যাইতে বলিলেই আমি যাইতে পারি।"

কিন্তু তিনি কিছুই বলিতেন না। পরিশেষে তাঁহার পরিবারবর্গ বলিতে লাগিলেন যে "তুমি এ বাসায় থাকিলে আমরা এখানে থাকিব না।" একদিন বিদ্যালয় হইতে আসিয়া দেখি, সত্যসত্যই তাঁহার পরিবারবর্গ গাঠী বোচ্‌কা বাঁধিয়া তাঁহাদের আত্মীয় মুন্সেফ ভগবানচন্দ্র সেনের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন। তখন গোপীবাবুর স্ত্রী দশম মাস অন্তঃসত্ত্বা। আমি আর গোপীবাবুর অনুমতি প্রতীক্ষা না করিয়া গিরিশবাবুর গৃহে চলিয়া গেলাম। তাঁহার পরিবার স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

হিন্দুসমাজ-পরিত্যক্ত আমরা ৪।৫টী যুবক গিরিশবাবুর বাসায় জুটিলাম। সেখানে প্রতিদিন স্নানান্তে একত্র উপাসনার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইল। আমাদের অনেকেরই অন্নবস্ত্রের সংস্থান নাই। কিন্তু ভগবান গরীবের মা বাপ হইয়া আমাদিগকে অন্নজল যোগাইতে লাগিলেন। কোনো কোনো ব্রাহ্ম ও সহানুভূতিকারী বন্ধু চাঁদা করিয়া আমাদের ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান আমার ভরণ পোষণের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন; পার্থিব আত্মীয় ব্যক্তি কিম্বা আমার নিজের উপর আর ভার রাখিলেন না। তখন হইতেই এক প্রকার বৈরাগ্যের জীবনের সূত্রপাত করিলেন। অন্নবস্ত্রের যদিও সংস্থান নাই, তথাপি মনে কোনোরূপ নিরুৎসাহ বা নিরাশা নাই, ভাবনা চিন্তা নাই।

এ দেশে চাঁদা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানের সচরাচর যে দশা হয়, আমাদেরও সেই দশা হইল। প্রথম কয়েক মাস চাঁদা আদায় হইল, ক্রমে অনেকেই বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন প্রতিদিন সমানে দুবেলা অন্ন জুটিত না। কোন কোন দিন কিঞ্চিৎ চিপিটক ভক্ষণ করিয়া স্কুলে যাইতাম। কিন্তু ভগবানের কৃপায় এরূপ একাহার কচিৎ কচিৎ মাত্র ঘটিত।

বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে দুই তিনটী সমপাঠী ব্রাহ্ম-বন্ধু ডবল প্রমোশন পাইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলেন। আমি তাঁহাদের অব্যবহিত নিম্ন স্থানে ছিলাম, তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগে আমি একান্ত অনিচ্ছুক হইলাম। আমি ডবল প্রমোশন চাহিলাম, শিক্ষক মহাশয়ও প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু আমার এই সামান্য ক্রটীতে পড়া শুনার বড় ব্যাঘাৎ হইল। সে ক্ষতি আর পূরণ করিতে পারিলাম না। কোনও রূপে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িলাম। সেখানেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইল।

বিবিধ।

১৮৭২ খৃঃ অঃ নিম্নলিখিত সঙ্কল্প সহকারে জীবন যাপন করিতে যত্নবান হইয়াছিলাম।

অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ করিব। সর্ব্বাগ্রে পরমেশ্বরের চরণ ধরিতে না পারিলে জীবন সুশৃঙ্খল হয় না। ঈশ্বরের চরণে জীবন সমর্পণই ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ।

এই সময়ে জীবনে নিম্নলিখিত সত্য পরীক্ষিত হয়। স্মৃতিপুস্তক হইতে উদ্ধৃত :—

অনেক দিন নিজে নানারূপ যত্ন করিয়া ভাল উপাসনা করিতে পারি নাই; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপার ভিখারী হইয়া উপাসনায় বসিলে, তিনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

যে দিন পিতাকে হৃদয়ে একটু উপলব্ধি করিতে পারি, সমুদয় জগৎ মধুময় বোধ হয়।

১৮৭২ খৃঃ অঃ জুন মাসে শ্রীনাথ বাবু ও আমি গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী গমন করি। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা বিধবা ভগ্নী শ্রীমতী সারদাসুন্দরীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসা হয়। প্রায় দেড় বৎসর কাল ময়মনসিংহে রাখিয়া তাঁহাকে লেখা পড়া ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদত্ত

হয়। শ্রীনাথ বাবু তখন জেলা স্কুলের পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত। ১৮৭৩ খৃঃ অঃ নবেম্বর মাসে চন্দননগরের বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে শ্রীমতী সারদার বিবাহ হয়। গোপাল বাবু প্রয়াগে রেলওয়ে বিভাগে বড় কর্ম্ম করিতেন। শ্রীনাথ ও আমি সারদাকে লইয়া কলিকাতা গমন করি। সেখানে আমরা প্রায় এক মাস কাল বাস করি। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। কলিকাতা ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে "ভারতাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত ছিল, আমরা প্রতি দিন আশ্রমের উপাসনায় যোগদান করিতাম। বহু সংখ্যক নরনারী মিলিত হইয়া প্রতিদিন উপাসনা হইত। এক দিন মহিলারা "পিতা এই কি সেই শান্তিনিকেতন" গানটী করিয়াছিলেন; আমি শান্তিনিকেতনের আভাস পাইয়া বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

এক সময়ে অভ্যাস ছিল, নূতন বৎসরের প্রথম দিনে কিম্বা অন্য কোনও বিশেষ সময়ে উপাসনাকালে এক এক প্রকার সঙ্কল্প করিতাম। ইংরেজী ১৮৭৩ সনের ১লা জানুয়ারী নিম্নোদ্ধৃত সঙ্কল্প করি।

১। পিতার সহিত জীবনের দৃঢ় যোগ সংস্থাপন করিব।

২। পিতার অনুসরণ করিব। তিনি সমুদায় নরনারীকে প্রেম করেন, আমি পবিত্র প্রেমের সহিত সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিতে যত্ন করিব।

প্রার্থনা :—পিতঃ, আমি নিজ বলে কোনো সঙ্কল্প জীবনে পরিণত করিতে পারি না। তুমি আমার নেতা হও, আমাকে শক্তি দেও। যখন পাপ প্রলোভন আমাকে আক্রমণ করে যেন তোমার চরণে কাঁদিতে পারি।

স্মৃতিপুস্তক, ১৮৭৩, মে—যখন পিতাকে হৃদয়ে দেখি, তখন

ভ্রাতার প্রতি স্বতঃ প্রেম ধাবিত হয়, কলহ বিবাদ চলিয়া যায়, অন্তরে শান্তি প্রেম বিরাজ করে; ভ্রাতার সহিত গলাগলি করিয়া পিতার চরণে পড়িতে ইচ্ছা হয়, কোনরূপ কুটিলতা থাকে না। পিতাকে ছাড়িলে হৃদয় নানারূপ কুটিলতা ও অসদ্ভাবের আগার হয়। পিতার গুণে যখন অন্তরে সদ্ভাব হয়, তখন আর সদ্ভাবের জন্য অহঙ্কারের কি কারণ? আমার নিজ গুণে সদ্ভাব আসিলে আর তাঁহাকে ছাড়িলে উহার তিরোধান হইত না।

২২শে আষাঢ়—"সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধনা" এইটী প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীর মূল মন্ত্র। সকল বিষয়ে ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। পিতার করুণা স্বীকার না করিলে হৃদয় শুকাইয়া যায়।

প্রতিদিন উপাসনাতে পিতার নিকট হইতে কিছু না লইয়া উঠিব না। ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে উপাসনা প্রার্থনায় যোগদান করিতে যত্ন করিব।

৭ই আশ্বিন—পবিত্র ঈশ্বরের যোগে ভাইভগ্নীদের প্রতি দৃষ্টি ভিন্ন, নরনারী সম্বন্ধীয় পাপ যায় না। পাপের চিন্তা ও আলোচনায় পাপ বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক মানবাত্মা নির্ব্বিকার ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে গঠিত, ইহা বারম্বার চিন্তা করিলে নরনারী সম্বন্ধে পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়।

মানবাত্মায় এক প্রকার প্রার্থনা ভগবান স্বয়ং উদ্রেক করেন। সে প্রার্থনার পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। প্রার্থিত বিষয় লাভ হইবেই এ বিশ্বাসও প্রার্থনা-সহজাত।

ব্রাহ্মসমাজে আমি নিজে বুদ্ধি যুক্তি করিয়া আসি নাই, ঈশ্বর নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন এবং অন্তরে উচ্চ আশা সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত আশা পূরণে তিনি দায়ী।

নিজের সমুদয় ভাব কল্পনা ছাড়িয়া যাহাতে সত্য সত্য ঈশ্বরকে

ধরিয়া জীবনের আমূল সংস্কার হয় তজ্জন্য যত্ন চাই। তাঁহাকে না ধরিলে কোন্ তুফানে কোন্ দিকে উড়িয়া যাইতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। চিরদিনের তরে যেন ঈশ্বরে মোহিত হইয়া থাকিতে পারি।

টাঙ্গাইলের নিকটবর্ত্তী সন্তোষ গ্রামে ব্রহ্মোপাসনার জন্য একখানা খড়ের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উক্ত গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আগমন করেন, শ্রীনাথ বাবু প্রভৃতি আমরা কয়েকজন উপস্থিত হই। গোস্বামী মহাশয়ের সহবাসে আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। সন্তোষ গ্রামে ব্রাহ্ম-সমাজের উপর এক অভিনব অত্যাচার হয়। উপাসনা গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বদিন বেঞ্চ, বেদী ইত্যাদি দ্বারা গৃহ সজ্জিত হইয়াছিল। রাত্রি-কালে ধর্ম্মবিদ্বেষীগণ গৃহসজ্জা সকল অপহরণ করিয়াছিল। প্রাতঃকালে আমরা মন্দিরে যাইয়া দেখি, গৃহ শূন্য। আমরা দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিয়া গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তনার্থ বহির্গত হইলাম। বেল্‌তা, সাঁক্‌রাইল, কাগমারী, সন্তোষ প্রভৃতি গ্রামে কীর্ত্তন হইল। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, গৃহময় মলমূত্র। একটী ভূঁইমালিনীকে যথেষ্ট পয়সা দিয়া গৃহ পরিষ্কার করা হইল। বিরোধীগণ মালিনীকে সমাজচ্যুত করিলেন। উৎসবের কয়েকদিন পরে উপাসনা গৃহ দগ্ধ করিয়া তাঁহারা উৎপীড়নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। ইংরেজ শাসনের ভয় না থাকিলে হয়ত উৎপীড়ন আরও ভীষণ হইত।

বিধাতা আমার মনে একটা প্রবল সত্যনিষ্ঠা প্রদান করিয়াছিলেন। কথার স্থিরতা রক্ষার জন্য বিলক্ষণ আগ্রহ ছিল। সন্তোষ হইতে প্রায় ছয় সাত মাইল দূরবর্ত্তী দেলদুয়ার নামক গ্রামে দুদিনের জন্য গমন করিয়াছিলাম। যে দিন ফিরিব বলিয়া গিয়াছিলাম সে দিন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঘরের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য, তত্রত্য বন্ধুরা তেমন দুর্য্যোগের দিনে আমাকে আসিতে দিতে একান্ত অসম্মত।

কিন্তু আমি ঝড় জলে ভিজিতে ভিজিতে চলিয়া আসিলাম। ঘন ঘন অশনিপাত হইতেছে, মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রবল বাত্যা—ছাতা খুলিবার সাধ্য নাই, পথে মাঠে জনমানুষ নাই সেই অবস্থায় কেবল কথার সত্যতা রক্ষার জন্য চলিয়া আসিলাম।

ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পরে ঈশ্বরের গৃহে সেবা-কার্য্যের আকাজ্ক্ষা হইয়াছিল। তখন আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র, এমন কোনও যোগ্যতা নাই, যদ্দ্বারা পিতার গৃহে সেবা করিতে পারি। কিন্তু কিছু না করিলেও তৃপ্তি বোধ হইত না। কিছুদিন চিন্তার পরে মনে হইল যে সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনার প্রাক্কালে মন্দির ঝাঁট দিব। তখন হইতে পিতার মন্দির পরিষ্কার, আলোক দান, ও চাঁদা আদায়ের ভার লইয়া শ্রদ্ধাসহ উহা সম্পন্ন করিতে লাগিলাম। এইরূপে পিতার গৃহে আমার দাসত্ব ব্রত আরম্ভ হইল। অপরাধী সন্তানকে দাসত্বে গ্রহণ করিয়া পিতা তাঁহার অপার করুণার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের কয়েক মাস পূর্ব্বে আমাদের শ্রেণীর তিন চারিটী ছাত্র লইয়া সময় সময় ধর্ম্মালোচনা ও প্রার্থনা করিতাম।

ময়মনসিংহে হিন্দু পৌত্তলিকগণ ব্রাহ্মদের প্রতি নানারূপ উৎপীড়ন করিতেন। সমাজচ্যুত ব্রাহ্মদের বাড়ীতে ভাণ্ডারী চাকর থাকিত না। এমন কি গৃহ নির্ম্মাণপটু কুলীদিগকে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদের বাড়ীতে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইত। একদা আমাদের বাসার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ঘরামী মজুর অভাবে আমরা স্বহস্তে গৃহ নির্ম্মাণে বাধ্য হইয়াছিলাম। বাঙ্গালী চাকর আমাদের বাসায় কখনও থাকিত না। সময়ে সময়ে হিন্দুস্থানী চাকর পাওয়া যাইত। অনেক সময় আমরা স্বহস্তে রান্না ও সর্ব্বপ্রকার গৃহ-কার্য্যনির্ব্বাহ করিতাম। যে কয়েকজন আমরা একত্র থাকিতাম, শ্রম বিভাগ করিয়া লইয়াছিলাম। শ্রীনাথ বাবু বাজার করিতেন,

শরৎ বাবু জল জোগাইতেন, আমি এবং হরিচরণ রান্না করিতাম। সামাজিক উপাসনা ও সঙ্গতের দিন পাক করিয়া খাইতে অনেক রাত্রি হইত। সকলে হয়ত ঘুমাইতেছেন আমি একাকী রান্না করিতেছি, কিন্তু তজ্জন্য উৎসাহের অভাব নাই, কিম্বা বিরক্তি নাই। একদিন সঙ্গতের পরে অধিক রাত্রিতে রান্না করিতেছি, ডাল সম্ভার দিয়া হাতা দ্বারা বিলোড়ন করিতে করিতে দেখি একটী ইন্দুরের ছানা উহাতে সিদ্ধ হইয়াছে। উপরিস্থ খড়ের চাল হইতে উহা পড়িয়া থাকিবে। সে রাত্রি লবণ ভাতই কৃতজ্ঞতার সহিত আহার করা গেল। আহারের সময় বিধাতার লীলার কথা লইয়া অনেক আমোদ হইল।

এক সময়ে দেওনারায়ণ নামে একজন হিন্দুস্থানী চাকর আমাদিগকে রান্না করিয়া খাওয়াইত। সে একবার যাহা পরিবেশন করিত, তাহাতেই সন্তুপ্ত থাকিতে হইত। পুনরায় তাহার নিকট ভাত চাহিলে বলিত, "ভাত নেহি হায়," ডাল চাহিলে বলিত, "ডাল নেহি হায়"। ঐ কথা শুনিয়া কৌতুক করিতে করিতে আমরা জল দ্বারা অবশিষ্ট উদর পূর্ণ করিতাম।

স্বহস্তে রন্ধন ও অন্নসংস্থানের অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়া ভগবান বৈরাগ্য ও নির্ভর শিক্ষা দিয়াছিলেন। পক্ষীমাতার ন্যায় ক্রমে তাঁহাকে ধরিতে শিখাইয়াছেন। যখন আমি কিছুই জানি না, তখন হইতেই পরবর্ত্তী জীবনের জন্য আমাকে প্রস্তুত করিয়াছেন।

নানাবিধ কারণে ময়মনসিংহস্থ ব্রাহ্মদের ভিতরে বড় মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। এক সময়ে সকলেই ভাই ভাই ছিলাম, পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারিলে, শ্রদ্ধা করিতে পারিলে, কোনওরূপ সহায়তা করিতে পারিলে কৃতার্থ হইতাম। এক্ষণে সমাজ মধ্যে তাহার বিপরীত ভাব সকল পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ইহাতে আমার প্রাণে বড় ক্লেশ

হইত। ময়মনসিংহের তাৎকালিক ব্রাহ্মদের মধ্যে আমি প্রায় সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলাম। কনিষ্ঠজ্ঞানে সকলেই আমাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, আমি জ্যেষ্ঠজ্ঞানে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতাম, কিন্তু জ্যেষ্ঠদের মধ্যে অসদ্ভাব দেখিয়া মন বড়ই ব্যথিত হইত। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া সময় সময় ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতাম। আমি কোনও বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করিতাম না। দলাদলীর ভাব, ভাইকে কোনরূপ নির্য্যাতনের ভাব আমার মনে স্থান পাইত না।

সঙ্গতে প্রসঙ্গাদি উপলক্ষে প্রায়ই ভ্রাতাদের মধ্যে ঝগড়া হইত। একবার ব্রহ্মোৎসবের পূর্ব্বে উৎসবের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণার্থ সভার অধিবেশন হয়। কার্য্যপ্রণালী স্থির হইয়া গেলে কে কোন দিন উপাসনাদি কার্য্য করিবেন তদ্বিষয়ে কথা হয়। পরস্পরের অসদ্ভাবের কথা লইয়া ঘোরতর বিরোধ বাধিয়া গেল, কেহই উপাসনার কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। আমি বেগতিক দেখিয়া ভগবানের চরণে শরণ লইলাম, শান্তি বিধানের জন্য তাঁর নিকট খুব কাতরে মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। তিনিও অন্তরে বিলক্ষণ আশা ও বল বিধান করিলেন। আমি করজোড়ে উপস্থিত সভ্যদিগকে বিনীতভাবে জানাইলাম যে যদি সকলে দয়া করিয়া কে কোন দিন উপাসনা করিবেন তাহা স্থির করিবার ভার আমাকে দেন এবং সকলে সহায় হন তবে আমি এ ভার লইতে প্রস্তুত আছি। এ প্রস্তাব শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন সেন প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মবন্ধু আগ্রহ সহকারে অনুমোদন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিতে আমার উপর ভার ন্যস্ত হইল। সভা ভঙ্গ হইল। তাহার দুই একদিন পরে আমি ভারগ্রস্ত দীনভাবে ভগবানের চরণ ধরিয়া বন্ধুদের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া যিনি যে দিন উপাসনা করিবেন, তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সকলেই আমার বিনীত অনুরোধ রক্ষা করিলেন। আশ্চর্য্যরূপে উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ

হইল। ভগবান এই উপলক্ষে আমাকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিলেন, যে যদি প্রাণ নিরপেক্ষভাবে তাঁহার চরণে ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে শান্তি সংস্থাপন জন্য প্রার্থী হয়, তবে তিনি সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন।

এসময়ে নিজের পাপ প্রবৃত্তির উপরে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। চিত্ত-ভূমি সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। নানা কারণে মনে বড় অশান্তি। শান্তিলাভের একমাত্র স্থান নির্জ্জনে। অনেক দিন রাত্রি দশটার পর ময়মনসিংহ গভর্ণমেণ্ট গির্জ্জার পার্শ্ববর্ত্তী নদীতটে বসিয়া ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতাম। সময় সময় ভগবান তাঁহার অপার করুণাগুণে প্রকাশিত হইয়া আমার মনের সন্তাপ হরণ করিতেন। অত্যন্ত লোভের সহিত সে স্থানে গমন করিতাম। প্রণয়ীরা যেমন কোনও নির্দ্দিষ্ট নির্জ্জন স্থানে সম্মিলিত হইতে ব্যগ্র হয়, আমার প্রাণও তদ্রূপ রাত্রির সেই সময়ে ঐ স্থানে যাইয়া প্রাণেশের প্রতীক্ষা করিতে ব্যাকুল হইত। দিনমানে মনে হইত, কখন রাত্রির সেই সময় সমাগত হইবে। প্রাণেশ্বর সেই নির্জ্জন স্থানে কতদিন দেখা দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, কত দিন বিরহানলে বিদগ্ধ করিয়া আমার প্রাণের অনুরাগ কাড়িয়া লইয়াছেন।

ব্রহ্মপুত্রতটে একটী খর্জ্জুর বৃক্ষ ছিল, বর্ষাকালে তাহার নিম্নদেশ দিয়া তর্‌তর্‌ করিয়া স্রোত বহিয়া যাইত, কখন কখন সেই সুরম্য স্থানে উপাসনা করিয়া সুখী হইয়াছি।

বিধবা ভগ্নীর ব্রাহ্মসমাজে আগমন।

আমার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী বাল্যকালে বিধবা হন। তাঁহার বৈধব্য যন্ত্রণা আমার প্রাণে বড় ব্যথা দান করিত। বিদ্যালয়ের ছুটীর সময় বাড়ী যাইয়া ভগিনীকে কিছু কিছু লেখা পড়া শিখাইতাম, তিনিও মনোযোগ সহকারে পাঠাভ্যাস করিতেন। একদা তিনি

আমাকে অনেক দুঃখ কষ্টের কথা বলেন। আমি তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া যাইতে প্রস্তাব করি, তিনি সম্মত হন। তৎপরবর্ত্তী পূজার ছুটীতে আমি নৌকা লইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিতে যাই, কিন্তু তখনও তাঁহার মন তেমন প্রস্তুত হয় নাই, সুতরাং তিনি যাইতে সাহসী হইলেন না।

১৮৭৪ খৃঃ অঃ গ্রীষ্মের ছুটীতে মুক্তাগাছার জমিদার বাবু অমৃতনারায়ণ আচার্য্যের একটী হাতী লইয়া বাড়ী গেলাম, বন্ধুবর শ্রীনাথ চন্দ ও বিহারীকান্ত চন্দ আমার সঙ্গে গেলেন। প্রায় ছয় মাইল দূরবর্ত্তী নন্দনপুর বাজারে হাতী ও বন্ধুদ্বয়কে রাখিয়া আমি বাড়ী গেলাম। রাত্রিকালে তাঁহারা আমাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিবেন। বাড়ী যাইয়া ভগিনীকে বলিলাম, তিনিও প্রস্তুত হইলেন। রাত্রিতে জাগ্রত হইয়া ভগবানের চরণে শরণ লইলাম, তিনি অন্তরে নিষেধাত্মক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, এবং আমার সমস্ত উদ্যম ভাঙিয়া দিলেন। আমার অন্তরাকাশ ভয়ানক মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল; ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, বাহিরের আকাশেও ঘনমেঘ। সে রাত্রি আমার নিকট কাল-রাত্রির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। একদিকে নানারূপ আয়োজন করা হইয়াছে, ভগিনীকে আশা দেওয়া হইয়াছে, দুইটী বন্ধু সমস্ত রাত্রি নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন; অপর দিকে উপাসনায় সায় পাইলাম না, বল পাইলাম না, মন ভাঙিয়া গেল। সে যাত্রায় আর ভগিনীকে আনা হইল না। কিন্তু সেই রাত্রির অন্তর-সংগ্রামে আমার শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। দুই তিন দিন পরে বাড়ী হইতে একাকী চলিয়া আসিলাম। বন্ধুদের নিকট মনের কথা ভাঙিয়া বলিতে সাহস হইল না। তাঁহারা মনে করিলেন যে মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ এরূপ হইয়াছে। তখন আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র, ছেলে মানুষ, ভগবানের অভিপ্রায়ের বিষয় বলিলে

কে বিশ্বাস করিবে ? কিন্তু ভগবান পরবর্ত্তী ঘটনাবলী দ্বারা আমাকে দেখাইয়া দিলেন, সে বার ভগিনীকে আনয়ন করিলে নানারূপ অনিষ্ট-পাতের সম্ভাবনা ছিল।

ডিসেম্বর মাসে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করি। সেখানে বেশ উৎসব ভোগ হইল। কিন্তু ঢাকার ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর দুরবস্থা দৃষ্টে বড় দুঃখ হইল। পূর্ব্বেও এই মণ্ডলীর যেরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থার বিষয় জানিতাম তাহাতেও ক্লেশ হইত। কখনও মনে হইত বঙ্গবাবুর জীবনে যে স্বর্গীয় অগ্নিকণা জ্বলিতেছে, উপযুক্ত তৃণাহুতির অভাবে সে আগুণ ভালরূপ প্রজ্জ্বলিত হইতে পারিতেছে না। আরো লোকের প্রয়োজন, কিন্তু সেস্থানে আমার ক্ষুদ্র জীবনেরও যে প্রয়োজন আছে তাহা তখনও মনে হয় নাই।

১৮৭৫ খৃঃ মে মাসে গরমের ছুটিতে পুনরায় একটী হাতী ও বন্ধুবর শ্রীনাথ সহ বাড়ী গমন করি। বাড়ীর প্রায় ছয় মাইল দূরবর্ত্তী নন্দনপুর বাজারে হাতী রাখিয়া একাকী বাড়ী যাই। বন্ধুর সঙ্গে কথা রহিল তিনি রাত্রিকালে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাতী লইয়া যাইবেন। বাড়ী যাইয়া বামাকে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম, তিনি প্রস্তুত হইলেন।

রাত্রিতে মাতৃদেবী ও আমরা সকল ভাই বোন এক ঘরে শয়ন করিলাম। নিশীথকালে গাত্রোত্থান করিয়া ভগবানের চরণে শরণ লইলাম, তিনি সায় দিলেন এবং অন্তরে প্রভূত বল সঞ্চার করিলেন। শয্যা ত্যাগ করিয়া বামাকে হাতে ধরিয়া তুলিলাম, এবং তাঁহার হাত ধরিয়া ভগবানের নাম লইতে লইতে বনের ভিতর দিয়া মাঠে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বামাকে একটী জামা পরাইলাম। নির্দ্দিষ্ট স্থান আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী, দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইলাম। একটী ক্ষুদ্র নদীতটে বন্ধুর থাকিবার কথা ছিল, তথায় আর জনমানব দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু নদীতে

যেন কেহ জল আলোড়ন করিতেছে। জেলেরা মাছ ধরিতেছে সংশয় করিয়া প্রথমতঃ একটু হটিয়া যাইতেছিলাম, পরক্ষণে মনে হইল উহা হাতীর কার্য্যও হইতে পারে, আবার অগ্রসর হইলাম। হাতী তীরে আসিল। আমরা সত্বর হাতীতে চড়িয়া ময়মনসিংহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পর দিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমরা গম্যস্থানে উপনীত হইলাম। গোপীবাবু তাঁহার পরিবারে শ্রীমতীকে আশ্রয় দান করিলেন।

গোপীবাবু নানা প্রকারে বহু লোকের উপকার করিতেন। নগর-বাসী কাহারো ব্যারাম পীড়া হইলে ঔষধ পথ্য ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারী দ্বারা সেবা করিতেন। ব্রাহ্মসমাজে তখন সেবার ভাব বিলক্ষণ দৃষ্ট হইত। আমরা এক দল যুবক ছিলাম, সকলেই দেহমন ঢালিয়া দিয়া লোকের সেবায় নিযুক্ত হইতাম। নৈশবিদ্যালয়, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, রোগীর সেবা প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাদের বিলক্ষণ উৎসাহ প্রকাশ পাইত।

দাসত্বে আহ্বান।

ইহার প্রায় বর্ষকাল পূর্ব্বে হইতে আমার জীবনের বিশেষ কার্য্য (mission) বুঝিবার জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থী হই। নানা সময়ে নানা দিকে মনের রুচি দেখিয়া এক এক দিকে গতি হইত। এইরূপ আন্দোলনে অনেক কাল চলিয়া গেল।

প্রতি বৎসর ২৩শে আষাঢ় আমাদের (ছাত্রদের) শাখাসমাজের উৎসব হইত। অনেকবার এসময়ে ঢাকা হইতে বঙ্গবাবু আসিতেন। এবারও তিনি ঈশানচন্দ্র সেনকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, উৎসব হইয়া গেল। এবার পাপের জন্য অনুতাপ ও মুক্তি লাভে আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইল। ২রা শ্রাবণ একাকী ব্রহ্মমন্দিরে প্রাণ খুলিয়া প্রার্থনা করিতেছি। পাপেতাপে জর্জ্জরিত আত্মা ভগবানের পদাশ্রয় ভিক্ষা

করিতেছে। ভগবান অন্তরে প্রকাশিত হইয়া এক গুরুতর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। "ঢাকাতে যাইয়া দাসত্ব গ্রহণ কর" এই নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু আমি তজ্জন্য প্রস্তুত নই, মনের ভিতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আমি নানা দিক ভাবিয়া ওজর আপত্তি করিতে লাগিলাম, কিন্তু প্রভু কিছুতেই মানিলেন না। আমি যখন রাজি হই তখন তাঁহার প্রসন্নতা বেশ অনুভব করি, যখন ওজর করি, প্রাণকে কেমন ম্লান করিয়া ফেলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ সংগ্রাম চলিল, পরে প্রার্থনা করিলাম "পিতা, তোমার অভিপ্রায় শিরোধার্য্য করিবার বল ও ক্ষমতা আমার নাই, আমি তোমার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা পূর্ণ কর।" প্রার্থনা করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলাম। কিন্তু একথা কাহাকেও বলিতে সাহস হইল না। পরদিন স্নানান্তে উপাসনার সময় প্রার্থনা যোগে ভগবান তাঁহার এই অভিপ্রায় মণ্ডলীকে জ্ঞাপন করিতে বাধ্য করিলেন।

অল্পদিন হইল ভগিনীটী আসিয়াছেন, ঢাকায় অসহায় অবস্থায় তাহাকে লইয়া গেলে অতিশয় ক্লেশ পাইতে হইবে বলিয়া বন্ধুরা অনেকে আমাকে ঢাকা যাইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। আমার কোনও হিতৈষী বন্ধু আমার জন্য একটি সামান্য চাকুরীর যোগাড়ও করিয়াছিলেন। কেবল বঙ্গবাবু ও গোপীবাবু আমার এই আদিষ্ট কার্য্যে সহানুভূতি করিলেন। বঙ্গবাবু ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে আমি বামাকে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিলাম।

বামা অল্পদিন হইল গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, দাদাই তাঁহার সর্ব্বস্ব। কোনো দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি আমার সঙ্গে চলিলেন।

৯ই শ্রাবণ আমরা ঢাকায় উপনীত হইলাম। বঙ্গবাবুর পরিবার তাঁহাদের পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীতে। জালালমিঞা ও গণেশবাবু সপরিবারে একটী ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতেন, আমরা সেই গৃহে আশ্রয় লইলাম।

ঢাকার প্রচারকমণ্ডলী গঠন।

এইবার ঢাকাতে স্থায়ী প্রচারকমণ্ডলীর সূত্রপাত হয়। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা বঙ্গবাবুর সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রচার কার্য্য করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, প্রায় তাঁহারা কেহই শেষ পর্য্যন্ত থাকেন নাই।

১৮৭৫ খৃঃ ১৭৯৭ শকের ২৩শে শ্রাবণ শনিবার সায়ংকালে বাবু কৈলাসচন্দ্র নন্দীর ছাপাখানার বাড়ীতে একটী সভা হয়। যাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গালায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আহুত বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা এই সভার সভ্য হন। সভার নাম হইল "ভ্রাতৃমণ্ডলী"। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়, কৈলাশচন্দ্র নন্দী, বিহারীলাল সেন, গণেশচন্দ্র ঘোষ, ঈশানচন্দ্র সেন ও আমি নাম স্বাক্ষর করিয়া সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলাম। প্রার্থনা সহযোগে সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। তৎপর দিন হইতে আমরা প্রত্যূষে স্নানান্তে বিশেষভাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাসনা সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। তৎপূর্ব্বেও একত্র উপাসনা হইত। এক্ষণে আমরা কয়জন ব্রতধারীর ন্যায় বিশেষভাবে তৎসাধনে প্রবৃত্ত। প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা কাল উপাসনা হইতে লাগিল। ভগবান আমাদের সমবেত অন্তর তাঁহার নব নব প্রকাশে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। অনতিকাল মধ্যে ভাই দুর্গানাথ রায়ও এই মণ্ডলীতে যোগদান করিলেন। আমরা সময় সময় কোনো উদ্যানে যাইয়া নির্জ্জন ধ্যানধারণায় নিযুক্ত হইতাম। সায়ংকালে সৎপ্রসঙ্গ হইত। আশ্বিনমাস পর্য্যন্ত এই প্রণালীতে সাধন স্রোত প্রবাহিত হইল।

পূজার বন্ধে আমরা দল বাঁধিয়া কুমিল্লার অন্তর্গত কালীগচ্ছ গ্রামে উৎসব করিতে গমন করি। এই গ্রামে বাবু আনন্দচন্দ্র নন্দী ও কৈলাশচন্দ্র নন্দীর বাস। তাঁহাদের বাড়ীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মোৎসব হইত। এবার ঢাকা ময়মনসিংহ হইতে আমরা অনেক লোক তথায় সমবেত হইয়া উৎসব ভোগ করিলাম। তথা

হইতে আমরা ঐ জেলার অন্তর্গত নাছিরনগর এবং শ্রীহট্টের অন্তর্গত সাঙ্গড় গ্রামে প্রচারার্থে গমন করি। উপাসনা প্রার্থনা সঙ্গীত ও প্রসঙ্গে কয়েক দিন বেশ কাটিয়া গেল। সাঙ্গড় গ্রামে শ্রীনাথ দত্ত ও পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের বাড়ী।

১৮৭৬ খৃঃ মাঘোৎসব সম্ভোগ মানসে ভগিনীকে লইয়া কলিকাতা গমন করি। এইবার উৎসবের কিছুদিন পরে সাধকদের শ্রেণী বিভাগ হয় এবং ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম সাধনের এক নবযুগ আরম্ভ হয়। উৎসবান্তে আমরা ঢাকায় ফিরিয়া আসি।

বাঙ্গলা প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস ছিল না, ঢাকা আসিয়া অবধি সময় সময় "বঙ্গবন্ধু" পত্রিকাতে ছোট ছোট প্রবন্ধ ও সংবাদ লিখিতে আরম্ভ করি। ১৭৯৮ শকের ১লা বৈশাখের "বঙ্গবন্ধুতে" "একাকী কত সুখ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখি। সেবাব্রত পালনার্থ ব্রাহ্ম-পরিবারদের বাজার করিয়া দিতাম। ক্রমে "বঙ্গবন্ধু" পরিচালনের ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। এ সময়ে "বঙ্গবন্ধুর" আর্থিক অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। গ্রাহকদের নিকট যে মূল্য আদায় হইত, তদ্বারা ডাকমাসুল ও কাগজের দামও চলিত না। আমার উপর কার্য্যভার ন্যস্ত হইলে ভগবানের কৃপায় ক্রমে ক্রমে ডাকমাসুল ও কাগজের মূল্যাদি নির্ব্বাহ হইবার উপযুক্ত অর্থ সমাগম হইতে লাগিল। প্রেসাধ্যক্ষগণই চিরকাল বিনামূল্যে উহা ছাপিয়া দিতেন।

বিবিধ।

এসময়ে প্রেম ভক্তি লাভের জন্য সকলের প্রাণে লালসা হইল। একদিন প্রাতে সংকীর্ত্তনের পর উপাচার্য্য মহাশয়ের প্রার্থনায় প্রকাশ পাইল যে যথার্থ প্রেম ভক্তি লাভ করিতে হইলে একদিকে পরম পিতাকে লাভ করা চাই, অপর দিকে ভাই ভগিনীদের সেবায় জীবন

যাপন করা চাই ; একটী ধর্ম্মপরিবার গঠন করিয়া ভাইভগিনী মিলিত হইয়া পিতার চরণে পড়িয়া থাকিলে তিনি যথাসময়ে আমাদিগকে প্রেম ভক্তি দান করিবেন। এই প্রার্থনা আমাদের কয়েক জনের মনে এক নবভাব আনয়ন করিল। তখনই আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইল। সকলেই তদ্বিষয়ে দেবালোক প্রাপ্ত হইলেন, কেবল গণেশ বাবু কোনও আলোক না পাইয়া কিঞ্চিৎ বিরোধী হইলেন। ৮ই আষাঢ় বিশেষ উৎসব করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইল। ষষ্টিবর্ষীয়া বৃদ্ধা ও দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা পর্য্যন্ত সকলেই প্রার্থনা করিলেন। প্রথমতঃ বঙ্গবাবু, ঈশান বাবু, দুর্গানাথ বাবু সপরিবারে এবং আমার ভগ্নীকে লইয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইল। তখন প্রয়োজন উপলক্ষে চট্টগ্রাম প্রবাসী পণ্ডিত রাজেশ্বর গুপ্ত ঢাকায় ছিলেন, তিনিও উৎসবে যোগদান করিয়া বিশেষ কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। বাবু বিহারীলাল সেন কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং আমি সহকারী সেবক নিযুক্ত হইলাম। প্রতিদিন প্রত্যূষে নামগান ও প্রার্থনা এবং মধ্যাহ্নে মধুর উপাসনা হইত, নরনারী সকলেই যোগদান করিতেন। একদিন ব্রাহ্মিকা সমাজ হইত। ক্রমে আশ্রমে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র বাড়ীতে আর লোক ধরে না। বড় বাড়ীর প্রয়োজন হইল, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা হওয়া কঠিন। সুতরাং আশ্রম ও ছাপাখানা মিলাইয়া একটী বাড়ীতে স্থাপনের উদ্যোগ হইল।

আষাঢ় মাসের শেষভাগে ময়মনসিংহ শাখা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উপাচার্য্য মহাশয় ও আমি তথায় গমন করি। তথায় ভগবান নানারূপে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে বিশেষরূপে কৃতার্থ করেন। তিনি পিতারূপে প্রকাশিত হইয়া জীবনের সকল ভার গ্রহণ করিলেন। পাপ দুঃখ সকল অবস্থায় তাঁহার উপর নির্ভর করিতে ইঙ্গিত করিলেন। নিম্নলিখিত সত্য পরীক্ষিত হইল।

মনে বাসনা কামনা প্রবল থাকিলে প্রভুর ইচ্ছা বুঝিবার জন্য অন্তরে সরল ব্যাকুলতা হয় না।

ভাইভগিনীদের প্রসন্নতায় ভগবানের প্রসন্নতা প্রকাশ পায়। তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভের জন্য প্রার্থনা করি। যে যে ভ্রাতার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিয়াছি, তাঁহাদের কাহারো নিকট ক্ষমা চাহিতে, কাহারো নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে, কাহারো চরণ মাথায় লইতে এবং কাহারো চরণ-ধৌত জলে স্নান করিতে আদিষ্ট হই। এই প্রণালীতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশেষ উপকার হইল।

ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞার সহিত ব্রত আরম্ভ করি।

১। আমি কোনও বিষয়ে বড় এ অহঙ্কার মনে আসিতে দিব না।

২। * * * * *

৩। কঠোর বাক্যে কাহাকেও আঘাত করিব না।

৪। চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে আমি অনুগত জনের ন্যায় থাকিব।

৫। ভ্রাতাদের প্রসন্নতা লাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিব।

আশ্বিন মাসে আমরা আশ্রম, “ইষ্ট” কার্য্যালয় ও ছাপাখানা ইত্যাদি লইয়া আর্ম্মানীটোলা ব্রজসুন্দর বাবুর বাড়ীতে গমন করি। এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মপরিবার সম্মিলিত হন। আশ্রমের ভারি জমাট অবস্থা। এই গৃহে যাইবার অব্যবহিত পরে আমরা ইটনা গ্রামে ৺কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী অন্নদা সুন্দরীর বিবাহ উপলক্ষে গমন করি। এই গ্রামের বাঙ্গালা স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাসের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ হয়। এ অঞ্চলে এই প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ; ঢাকা, ময়মনসিংহ হইতে প্রায় পঁচিশ জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

ঢাকা রমনার মাঠ আমাদের এক প্রকার সাধনক্ষেত্র ছিল।

সেখানে অনেক দিন ধ্যানধারণা করা হইত। এই সময়কার একটী প্রার্থনা স্মৃতিপুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। "হে পরমেশ্বর, তুমি কেমন আশ্চর্য্য রূপসাগর! ও সাগরে যাঁহারা ডোবেন, তাঁহারাও তোমার রূপে রূপবান্ হন। হে রূপসাগর, আমাকে এবং আমাদের মণ্ডলীর কয়েকজনকে তোমার অপরূপ রূপসাগরে ডুবাইয়া উঠাও। আর চারিদিকের ভাইভগ্নীরা তদ্দর্শনে তোমাতে আকৃষ্ট হউন।"

২৫শে আশ্বিন রমনার টিলায় উপাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে ধ্যান বিষয়ে প্রসঙ্গ হয়। ধ্যানে আমার একটুকু বিশেষ রুচি দেখিয়া তিনি তদ্বিষয় বিলক্ষণ উৎসাহ দান করেন।

ভগ্নীর বিবাহ।

আমার প্রিয়তমা ভগ্নী বামা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সরল ভাবে কোন কথা কহিতে সঙ্কুচিতা হইতেন না। আমি তাঁহার বিবাহ বিষয়ক অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে তিনি যেরূপ সরলতার সহিত সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম।

এ বিবাহে আর কোনো মানুষকে ঘটকালী করিতে হয় নাই, স্বয়ং বিধাতাই সে কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীনাথের মন বামার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি সে অভিপ্রায় আমার নিকট জ্ঞাপন করেন। আমি ভগবানের আলোক ভিক্ষা করি। মিঞা সাহেবের ময়দানে আশ্রম বাটিকার ছাদে নির্জ্জনে বসিয়া এ বিষয়ে তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হই। বামার নিকট প্রস্তাব করি। তিনি বলেন "আপনার যাহা ভাল বোধ হয় করুন, আমার আপত্তি নাই।" তৎপর প্রস্তাব ধার্য্য হয়। পূজার ছুটিতে শ্রীনাথ ঢাকায় আসেন এবং শ্রীমতী বামা আমার অনুমতিক্রমে একটী কুসুমস্তবক দ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করেন।

আমরা ময়মনসিংহ জেলা বাসী, সে নগরে আর কখনও ব্রাহ্মবিবাহ

হয় নাই। সুতরাং সকলের অভিপ্রায় অনুসারে সেখানেই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়া ধার্য্য হইল। ১৮৭৬ খৃঃ ১৭৯৭ শকের ১৫ই কার্ত্তিক ৺কালীকুমার বসুর বাস ভবনে শুভ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ও বঙ্গচন্দ্র রায় পুরোহিত ও আচার্য্যের কার্য্য করেন। তখন শ্রীনাথের বয়স ষড়বিংশ ও বামার উনবিংশতি। শ্রীনাথ জেলা স্কুলে কুড়ি টাকা বেতনে দ্বিতীয় পণ্ডিতের কাজ করিতেন। এ নগরে এই প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ ও বিধবাবিবাহ। বিবাহ দেখিবার জন্য লোকের মহা ভিড় হইয়াছিল। সুপ্রশস্ত গৃহ-অঙ্গন লোক পূর্ণ, চতুর্দ্দিকের গাছে গাছে লোক, রাজপথের প্রায় সিকি মাইল ব্যাপিয়া মহা জনতা। জন কোলাহলে বিবাহ-মন্ত্র শোনা গেল না। এই রাত্রিতে কার্ত্তিকের ভীষণ ঝড়ে ও প্লাবনে বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলার বহু লোক বিনষ্ট হয়। ময়মনসিংহে অতি সামান্য ঝড় হইয়াছিল, নিশীথকালে বিবাহ-আসরের সামিয়ানাটী মাত্র ভূপতিত হইয়াছিল। বিবাহ উপলক্ষে প্রায় সপ্তাহকাল উপাসনা কীর্ত্তনে এক উৎসব তুল্য ব্যাপার হইল। তৎপর আমরা ঢাকায় চলিয়া আসি।

২৯শে কার্ত্তিক ঢাকা নগরে আমাদের বন্ধুবর কৈলাশ্চন্দ্র নন্দীর সহিত সোহাগদলের ব্রাহ্ম পরিবারস্থ শ্রীমতী বগলাসুন্দরী গাঙ্গুলীর বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়।

বিবিধ।

অনেক দিন যাবৎ পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার বাসনা ছিল, এবার পৌষ মাসে এক সুযোগ উপস্থিত হইল। শ্রীনাথ বাবু জলবায়ু পরিবর্ত্তন জন্য এলাহাবাদ যাইবেন, তিনি আমাকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি হাজি পট্টুর বাগানে নির্জ্জন উপাসনার সময় প্রভুর অনুমতি জিজ্ঞাসু হই, তিনি নিষেধ করেন। আমার কিছু

সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইল। অনেক দিনের অভিলাষ পূর্ণ হইবার উপায় হইল, বন্ধু ব্যক্তিরও উপকার হয় ইত্যাদি ভাবনায় মন আন্দোলিত হইতেছিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে একবার প্রভুর নিষেধ না মানিয়া যে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে রহিয়া গেলাম।

মাঘোৎসবে কলিকাতা গমন করি। এবার ধর্ম্মসাধনের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পায়। মোড়পুকুর "সাধনকাননে" এক দিন উদ্যান-সম্মিলন হইয়াছিল। সাধু অঘোরনাথ ও বিজয়বাবু তাঁহাদের সাধনকালে যে সকল উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম পাঠ করেন। তৎশ্রবণে বিশেষ উপকার হয়। এবার আমরা মাসাধিককাল কলিকাতা বাস করি। তখন মফঃস্বল যাত্রীদের থাকিবার কোনও ব্যবস্থা হইত না, নিজের নিজের আত্মীয় বন্ধুর বাড়ীতে থাকিতে হইত। ভাই দুর্গানাথ রায় ও আমি এক স্থানে প্রতিদিন দুবেলা ভাতে ভাত রাঁধিয়া খাইতাম। কিন্তু এ ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া মনে হইত না। প্রতিদিনের উপাসনা ও প্রসঙ্গ অতি উপাদেয় বোধ হইত।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিলীলার আদি স্থান মুঙ্গের ধাম দর্শনে এবং তথায় নির্জ্জন সাধনে অভিলাষী হইয়া প্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করি, এবং অনুমতি লাভ করি। তখন আবার আর একরূপ পরীক্ষা উপস্থিত হইল। এক দিকে আর্থিক সম্বলাভাব, অপর দিকে এ বিষয় কাহারো সহানুভূতি পাইবার আশা নাই। প্রভুর উপর সকল নির্ভর। এ বিষয় কাহাকেও জানাইতে ইচ্ছা হইল না অথচ বঙ্গবাবুকে না জানাইয়া যাওয়াও ঠিক বোধ হইল না। যাত্রার দিন তাঁহাকে গোপনে বলিয়া গেলাম।

১২ই ফাল্গুন সকাল বেলা মুঙ্গের পৌছিলাম। পথে ট্রেনে

বিনামা হারাইলাম। সেখানে কোনও পরিচিত লোক নাই, পরিচয়-সূচক পত্রাদিও আনা হয় নাই। বড়ই বিপন্ন হইলাম, প্রভু মাত্র ভরসা। তাঁহারই কৃপায় পূর্ব্ববাঙ্গলাবাসী জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে এক দিনের জন্য আশ্রয় পাইলাম। এই অসহায় বিপন্ন অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া প্রভু আমাকে তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী করিলেন। তিন দিন ঘুরিয়া কোথাও আশ্রয় পাইলাম না। কিন্তু দয়াময় প্রভু গোপনে আমার জন্য সকল আয়োজন করিয়াছিলেন। মুঙ্গের পৌঁছিয়া সেই দিনই বৈকালে পীড়পাহাড় নামক পাহাড়ে গমন করি। তথায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ীতে দুইটী ছাত্র স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গলাবাসী, এক জনের নাম গোবিন্দচন্দ্র রায় ও অন্য জনের নাম অমৃতলাল সিংহ। গোবিন্দ বাবু মুকুন্দ বাবুর ভগ্নিপতি। আমার সহিত তাঁহাদের আলাপ হইল এবং আমার অবস্থা দর্শনে তাঁহাদের সহানুভূতি হইল। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের নিকট থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু উক্ত বাড়ীর স্থানীয় তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে স্থান দিতে সম্মত হইলেন না, পরন্তু নানারূপ কটুকাটব্য বাক্যে ভৎর্সনা করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলেন।

ছাত্রবন্ধুদ্বয়ের কলিকাতাস্থ আত্মীয় বাবু মুকুন্দনাথ রায় হাই-কোর্টের উকীল আমার পরিচিত বন্ধু। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ঐ বাড়ীর অধিকারী, তাঁহার অনুমতি লইয়া পাঠাইবার জন্য আমরা তিন জনে মুকুন্দ বাবুকে পত্র লিখিলাম। সেই অনিশ্চিত অবস্থায় তৃতীয় দিন মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের সঙ্গে মন্দিরে যাইয়া উপাসনায় যোগদান করি এবং ব্রাহ্মদের সঙ্গে পরিচয় হয়। কলিকাতা হইতে কোনও পরিচয়পত্র না আনাতে তাঁহাদের মনও সংশয়রহিত বলিয়া মনে হইল না।

তৎপর দিন পুনরায় পীড়পাহাড় যাইয়া দেখি, মহারাজার অনুমতি পত্র আসিয়াছে। এই প্রকার অভাবনীয় রূপে ভগবান আমাকে তথায় থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মুঙ্গের পীড়পাহাড় নির্জ্জন সাধনের উপযুক্ত স্থান। এরূপ ঘটনাবলী না ঘটিলে আমার সেখানে বাস করিবার সুযোগ হইত না। তাই ভগবান আপনার চক্রান্তে দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। আমার তথায় যাইবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি উপায় না করিলে আমার সেখানে থাকা অসম্ভব ছিল।

প্রতিদিন প্রাতে পাহাড়ে নির্জ্জনে ধ্যান, স্নানান্তে পাহাড়ের শীর্ষস্থ গম্বুজে সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনা, বৈকালে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, সায়ংকালে ছাত্রবন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করা যাইত। দুই চারি দিন তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনার পর তাঁহারা উপাসনায় যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে সায়ংকালে তাঁহাদিগকে লইয়া সংক্ষেপে উপাসনা করিতাম, বৈকালে ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠ করিয়া শুনাইতাম। এইরূপে প্রভু তাঁহার দাসের জন্য একটু কার্য্যক্ষেত্রও খুলিয়া দিলেন।

এ যাত্রায় ভগবানের সুমিষ্ট আবির্ভাব উপলব্ধি ও প্রকৃতিতে তাঁহার প্রকাশ বিলক্ষণ সম্ভোগ হইল। প্রতি রবিবার মুঙ্গের যাইয়া সামাজিক উপাসনায় যোগদান করিতাম। কয়েক দিন একত্র উপাসনা ও ধর্ম্মালাপে উক্ত ছাত্র বন্ধুদের বেশ উৎসাহ হইল। পীড়পাহাড় ছাড়িবার পূর্ব্বদিন একপ্রকার ক্ষুদ্র ভাবে তথায় উৎসব হইল। তৎপর কিছু দিন মুঙ্গেরনগরে বাস করি। ফিরিয়া আসিবার পাথেয় সম্বল ছিল না, প্রভু কোনও বন্ধুর যোগে তাহা দান করিলেন। পীড়-পাহাড়ের একটী প্রার্থনা স্মৃতিলিপি হইতে উদ্ধৃত হইল।

"হে গম্ভীর পুরুষ ভগবান, ধর্ম্মের অনেক সুখ শান্তি প্রদান করিয়াছ। কত সময় কত ভয়ানক পাপ প্রলোভন ও পরীক্ষা হইতে

রক্ষা করিয়াছ। যখন প্রলোভনে পড়িয়া—দুর্দ্দান্ত রিপুর হাতে প্রাণ মৃতপ্রায় হইয়াছিল—বাঁচিবার আশায় হতাশ হইয়াছিলাম, তখন কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে পাপীকে রক্ষা করিয়াছ। ভ্রাতা ভগিনী পরিবেষ্টিত হইয়া কত সময় তোমার নামরস, প্রেম সুধাপান করিতে দিয়া কৃতার্থ করিয়াছ, প্রকৃতির সুন্দর মুখচ্ছবিতে তোমার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া তৃপ্ত করিয়াছ। ইচ্ছা হয় এইরূপে তোমার ধর্ম্মের সুখাস্বাদন করিয়া জীবন কাটাই। কিন্তু দেব, এখনও কেবল তোমাকে লইয়া, বাহ্য জগৎ ভ্রাতা ভগিনী অপর সমুদয় ছাড়িয়া, আত্মার অতি গভীর স্থানে অবতরণ পূর্ব্বক যে স্থানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নাই, বাহ্য জগৎ নাই,—ঘোর গভীর অন্ধকার—সেই স্থানে পাঁচ মিনিটকাল তোমায় লইয়া থাকিতে প্রাণ কেমন ফাঁপর করে, সেখানে মন থাকিতে চায় না; বাহিরে আসিতে, ভাইভগিনীর সহিত মিলিতে, সুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সুযোগ অন্বেষণ করে। প্রভো, প্রাণের উপর এমন এক চাপ দেও, যেন উহা আর ভাসিয়া উঠিতে না পারে, যেন উহা তোমাতে তলাইয়া যায়। আশীর্ব্বাদ কর যেন সেই জন-কানন-পরিশূন্য স্থানটী আমার প্রিয় আবাস-ভূমি হয়।"

ধ্যানে নিরবলম্ব ব্রহ্মসত্তা ধারণ, জীবনে ও কার্য্যে তাঁহাকে ওতপ্রোতভাবে সংজড়িত দেখা চাই।

প্রতিদিন ব্রহ্মকে নূতন ভাবে দেখিতে হইলে অন্তরের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করা চাই। যতই তৃষিত হই, ততই ব্রহ্ম-রূপ নব ভাবে দেখিতে পাই।

প্রায় বর্ষকাল ব্যাপী যোগসাধন ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সাধু অঘোর নাথ চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে প্রচারার্থ পশ্চিমাঞ্চলে যাইতেছেন। মুঙ্গেরে দুই দিন ছিলেন। প্রাতে স্নানান্তে মন্দিরে উপাসনা ও সায়ংকালে সামাজিক উপাসনা হইল। বৈকালে মন্দিরের সম্মুখস্থ

বাগানে তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে প্রসঙ্গ হইল। তিনি ব্রহ্মদর্শন করিয়া এমন প্রত্যক্ষবাদীর ন্যায় কথা বলিলেন যে তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আমার ব্রহ্মোপলব্ধি হইতে লাগিল। কি এক অরূপ রূপ দর্শনে তাঁহার চক্ষে বারিধারা বহিতে লাগিল।

এসময়ে তিনি স্বপাক ভোজন করিতেন। এক দিন আমাকে রান্না করিয়া খাওয়াইলেন। তিনি বেশ রান্না করিতে পারিতেন। তিনি গয়াধামে চলিয়া গেলেন। আমি জামালপুর, ভাগলপুর, ও বর্দ্ধমান বেড়াইয়া কলিকাতা উপনীত হইলাম। এলাহাবাদ হইতে শ্রীনাথ ও বামা কলিকাতা আসিলে আমরা একত্র ঢাকায় আসি। তথা হইতে শ্রীনাথ বাবুরা ময়মনসিংহে চলিয়া যান।

ঢাকা অবস্থিতি কালে রাত্রির আহারান্তে অনেক দিনই আমরা উপাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতাম। ১৮৭৭ খৃঃ শ্রাবণ মাসে ব্রতধারণ পূর্ব্বক নিয়মিতরূপে ধর্ম্মসাধনের প্রসঙ্গ হয়। তখন কোনও বিষয় আগ্রহ সহকারে প্রসঙ্গ হইলে ভগবানের দিকে তাকাইয়া যদি তদ্বিষয়ে তাঁহার সায় পাওয়া যাইত, অবিলম্বে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্ন হইত।

১২ই শ্রাবণ এবিষয়ে প্রসঙ্গ হয়, ১৩ই শ্রাবণ ভাই দুর্গানাথ ও আমি ব্রতগ্রহণে প্রস্তুত হইয়া উপাচার্য্য মহাশয়কে পত্র লিখি। এবিষয়ে তথাকার ভ্রাতৃমণ্ডলীর সকলের সহানুভূতি হইল না বলিয়া রাত্রিযোগে সংগোপনে ব্রজসুন্দর বাবুর বাড়ীর নিম্নতলস্থ এক অন্ধকারময় কুঠরীতে বসিয়া আমরা তিন জনে প্রসঙ্গ করি। ১৫ই শ্রাবণ প্রায় মধ্য রজনীতে আমরা সেই গুপ্তস্থানে ব্রতগ্রহণ করি। প্রার্থনা ও উপদেশযোগে আমাদিগকে ব্রত প্রদত্ত হইল এবং নিম্ন-প্রণালীতে এক পক্ষকাল ব্রত পালনের ব্যবস্থা হইল।

ব্রতবিধি।

প্রাতঃকাল—১। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে নাম কীর্ত্তন ও নাম শ্রবণ। তৎপর ৯টা পর্য্যন্ত যোগতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ পাঠ এবং আবশ্যক মত উপদেশ শ্রবণ।

মধ্যাহ্ন—২। আশ্রমের পারিবারিক উপাসনায় যোগ দান। ৩। বিশেষ ভাবের সহিত কিছু কিছু বৈষয়িক কার্য্য। ৪। পর সেবা, বৃক্ষাদি ও ইতর জীবের সেবা।

অপরাহ্ন—৫। ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ। ৬। নামজপ। ৭। সৎপ্রসঙ্গ। ৮। নিশীথকালে বিশেষভাবে কেবল ব্রহ্মসত্তা সাধন। ৯। আবশ্যক মত এ বিষয়ে প্রশ্নাদি।

এক পক্ষ কাল ব্রতপালনান্তে পুনরায় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে তিন মাস কাল সাধনের ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে ভাই দুর্গানাথ রায়ের সঙ্গে নিগূঢ় তত্ত্বের প্রসঙ্গ হইত।

আমার রক্তপিত্তের ব্যারাম ছিল, গলা দিয়া অল্প অল্প রক্ত পড়িত। এই সময়ে পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। মত্ত গ্রামবাসী কবিরাজ অমৃতানন্দ দাসের চিকিৎসার্থী হইয়া মাণিকগঞ্জে গমন করিলাম। তখন সেখানে বাবু চণ্ডীচরণ সেন মুন্সেফ এবং বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। চণ্ডীবাবুর বাসায় আমি থাকি। প্রভু পরমেশ্বরই দাসের সকল অভাব মোচন করেন; তিনি অমৃতবাবু যোগে ঔষধ ও চণ্ডীবাবু সহযোগে পথ্য বিধান করিতে লাগিলেন। চণ্ডীবাবুকে লইয়া মাঝে মাঝে একত্র উপাসনা করিতাম।

১২ই ভাদ্রের একটী প্রার্থনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"হে প্রিয় দেবতা, তুমি বড় মধুময়। তোমার মিষ্টতা ও সৌন্দর্য্য অতি প্রশান্ত ও নির্ম্মল। যখন আমার মন ভুলাইবার জন্য, আমার

রুগ্নাবস্থায় রোগ যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য চারিদিকে তোমার সুখময় সুন্দর আবির্ভাব বিস্তার কর, তখন তোমায় দেখিয়া মোহিত হই। প্রাণেশ্বর, তোমার মাধুর্য্য-রসের প্রকাশযোগ্য কথা নাই। প্রভো, আমার মত হীনমতি লোকের প্রতি তোমার এত প্রেম কেন? কেন প্রভো, এই নির্জ্জন গ্রামের মধ্যে পাপীকে প্রেমের আলিঙ্গন চাপে আবদ্ধ করিতেছ? নাথ, যদি এমন স্নেহের ভাব দেখাইলে, যেন চিরকাল তোমার প্রেম দেখিয়া, সৌন্দর্য্য দেখিয়া এ প্রাণ শীতল করিতে পারি।"

"পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে।" সাধু অঘোরনাথকে আমার পীড়ার অবস্থা জ্ঞাপন করি এবং আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তিনি তদুত্তরে যে স্নেহপূর্ণ পত্র লিখেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

মুঙ্গের

"প্রিয় বৈকুণ্ঠ, ২৭শে ভাদ্র।

তোমার পত্রখানি পাইয়াছি। তোমার পীড়ার কথা শুনিয়া মনে নিতান্ত দুঃখ হইল, এত অল্প বয়সে তোমার এরূপ উৎকট রোগ জন্মিল কেন? অত্যন্ত সতর্ক হইবে, যেন কোনরূপে অত্যাচার না হয়। শরীরের প্রতি এরূপ অবস্থায় যত্ন করা ধর্ম্মের একটী অঙ্গ জানিবে। অল্প বয়সেই পীড়াতে যদি জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় তবে তাহার মত আর দুঃখের ব্যাপার নাই; এরূপ অবস্থায় কেবল ঈশ্বরই ভরসা, নতুবা আর কোন উপায় নাই। তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিয়া এরূপ ক্লেশ বহন করাই সৌভাগ্যের কার্য্য বলিতে হইবে। যাহা হউক জীবনের প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌরভ তিনি, এজন্য তাঁহার সঙ্গে গাঢ় যোগ রক্ষা করিবে। বালকের সুললিত ভাবে তাঁহাকে ডাকিবে। আপনার প্রিয়তমকে না ভুলিয়া বরং এরূপ অবস্থায় আরও তাঁহার অনুগত হইবে। দেখো যেন কোনরূপ ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য না ঘটে।

অসময়ে অনেক শত্রু আসিয়া যোটে, তাহাদের কথায় বধির হইবে। কেবল আপনাকে আর এক জনের হাতে ছাড়িয়া দিবে। সেই দিকে দৃষ্টি যত তোমার প্রবল হইবে, মনের বল তত বাড়িবে। হৃদয়ের শান্তি তত লাভ করিতে পারিবে। আপনাকে তাঁহার ভিতর লুক্কায়িত রাখিবে। তাহা হইলে পৃথিবীর কোলাহল বড় শুনিতে পাইবে না। তোমার পক্ষে এখন ইহাই প্রার্থনীয়, কারণ না হইলে তোমার মন সহজে বিক্ষিপ্ত হইবে। মনকে কোনরূপে বিক্ষিপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে জীবনের কেবল অস্থায়ী ভাব প্রকাশ পাইবে। এই অবকাশে শরীর মন শুদ্ধ করিয়া লইবে। কোনরূপ অপবিত্রভাব মনের ভিতর স্থান দিবে না, তাহা হইলে জানিবে যে রোগও মঙ্গলের কারণ। এরূপ কারণ প্রতীতি না করিয়া মানুষ রোগের অবস্থায় বড় অবিশ্বাসী হয়, অত্যন্ত বিরক্তি আসিয়া মনকে বড় বিরক্ত করে। রোগ তো দিন দিন আরাম হইয়া আসিতেছে? কোনরূপ বৃদ্ধি নাই তো? তাহা হইলেই ভাল। যেখানে আছ, সেখানকার জলবায়ু ভাল তো? সুস্থতার পক্ষে কোনরূপ হানিজনক নয় তো? চণ্ডী বাবুকে আমার নমস্কার।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

অঘোর"

চণ্ডীবাবু মাণিকগঞ্জ হইতে বদলী হইলেন, পূর্ণবাবু আমাকে তাঁহার গৃহে স্থান দান করিলেন। সাবডিবিশনাল অফিসারের বাঙ্গলার দক্ষিণ দিকের কোঠায় বাস করিতাম, এবং বারাণ্ডায় বসিয়া উপাসনা, ধ্যান ও ধর্ম্ম-গ্রন্থ-পাঠে দিনাতিপাত হইত। এক এক দিন পিতার প্রেমময় রূপে প্রাণ ভরিয়া যাইত।

রুগ্নাবস্থায় ব্রতপালন বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সময়ে সময়ে শৈথিল্যও হইয়াছে। ব্রতধারীর মনে পাছে অহঙ্কার সমুপস্থিত হয়,

এই হেতু প্রভু অবস্থায় ফেলিয়া শিথিলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। জীবনের সকল ব্যাপারেই মঙ্গলদাতার বিশেষ অভিপ্রায় আছে। নির্জ্জন সাধন ও গোপন প্রচার জন্যই তিনি এবারকার ব্যারাম বিধান করিয়াছেন। পীড়া বৃদ্ধি করিয়া তিনি আমাকে তাঁহার জন্য অধিকতর ব্যাকুল করিয়া আত্মস্বরূপ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিলেন, আপনার প্রেমের পরিচয় দান করিলেন, দাসত্বের শৃঙ্খল আরো সুদৃঢ় করিলেন। এ জীবন তাঁহারই জন্য যাপন করিব, এবিষয়ে দৃঢ়তা বিধান করিলেন। ভগবান কাহাকে কোন্ অবস্থায় ফেলিয়া তাঁহার করিয়া লন তাহা কে বলিতে পারে?

মানিকগঞ্জ হইতে ঢাকা যাই, সেখান হইতে ১৭ই কার্ত্তিক ময়মনসিংহে পৌছি। তৎপর দিন শ্রীনাথবাবুদের বাসায় পারিবারিক উপাসনা করি। জড় অতিক্রম করিয়া অজড় চিণ্ময় ঈশ্বরে প্রবেশ বিষয়ে প্রার্থনা হয়। রাত্রিতে শ্রীনাথবাবু ও প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহ এবিষয়ে অতি মিষ্ট প্রসঙ্গ হয় এবং ইহা দ্বারা তাৎকালিক পারিবারিক উপাসনায় এক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ঐ দিনের প্রসঙ্গের সময় ভগবানের প্রতি বেশ দৃষ্টি-নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু শেষভাগে একটু আমিত্বের গন্ধ আসিয়াছিল। এই হেতু তৎপর দিন আর প্রসঙ্গ জমাট বাঁধিল না। ঠাকুরের শাসন বড় তীব্র!

১৮৭৭ খৃঃ ২৭শে কার্ত্তিক রবিবার শ্রীনাথবাবু এবং বামার প্রথম পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। বামার সন্তান লাভে আমার কত আহ্লাদ! বামার সন্তান লাভে ভগবানের বিচিত্রলীলা প্রকাশ পাইল। সামাজিক প্রথানুসারে যাহার জীবন দুঃখ লাঞ্ছনায় যাপিত হইত, ভগবানের কৃপায় ও কৌশলে সে পতিপুত্র লাভ করিয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। বিধাতার কৌশলে অসম্ভব সম্ভব হইল।

অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে আসি। ১৮৭৮ খৃঃ জানুয়ারী মাসে মাঘোৎসবে কলিকাতা গমন করি। এবার কোচবিহার বিবাহের বৎসর। আমরা বিবাহের প্রস্তাবনা মাত্র শুনিয়া গেলাম। সম্বন্ধ স্থির হইলে এক দল ব্রাহ্ম দেশময় ঘোরতর প্রতিবাদের আন্দোলন উত্থিত করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে ঘোরতর পরীক্ষার অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ভগবানের আদেশে কোচবিহারের মহারাজার সঙ্গে তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর বিবাহ দেন। তখন মহারাজার সাড়ে ১৫ বৎসর এবং আচার্য্য দুহিতার সাড়ে ১৩ বৎসর বয়স। এ বিবাহ বাগ্‌দান স্বরূপ হইল। বিবাহের অব্যবহিত পরে মহারাজা শিক্ষার জন্য বিলাতে প্রেরিত হন। তৎপর স্বদেশে ফিরিলে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উপাসনাদি যোগে বিবাহের পূর্ণতা সাধন হয়।

আমাদের ঢাকাস্থ মণ্ডলীর উপাচার্য্য বঙ্গবাবু এবং ভাই দুর্গানাথ মুঙ্গেরে ছিলেন। ঢাকায় তুমুল আন্দোলন। তখন "বঙ্গবন্ধু" পত্রিকা সম্পাদনের ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। "বঙ্গবন্ধুতে"ও প্রতিবাদ করিবার জন্য অধ্যাপক ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ আমাকে বারম্বার উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও কাগজে এবিষয়ে আন্দোলন করা আমার নিকট সঙ্গত বোধ হয় নাই। ক্রমে আন্দোলনের গতি দেখিয়া আমার মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে আচার্য্যদেবকে অপদস্থ করা, তাঁহাকে নির্য্যাতন করাই প্রধান প্রতিবাদকারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে আর সহানুভূতি করিতে পারিলাম না। ইহাতে বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বড়ই বিরক্ত হইলেন এবং পুস্তক ও প্রকাশ্য পত্রিকায় আমার এবং প্রতিবাদ-বিরত ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে নানা কথা প্রচার করিতে লাগিলেন।

নানা কারণে ও নানা ঘটনায় কতিপয় প্রধান ব্রাহ্ম আচার্য্য

কেশবচন্দ্রের প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত ছিলেন। তাঁহারা সুযোগ পাইয়া মহা বিরোধের অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, নিরীহ শান্তপ্রকৃতি ধর্ম্মশীল বহু ব্রাহ্ম প্রধান আন্দোলনকারীদের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৮৭৮ সালের ৬ই মার্চ্চ কোচবিহার বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। বিরোধী বন্ধুগণ যে পথে চলিয়া যে দশা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা বাহুল্য। "বঙ্গবন্ধু"তে "পথিক" নাম দিয়া একটী আখ্যায়িকা প্রকাশ করি, তৎপাঠে বিরোধী বন্ধুরা কেহ কেহ বিরক্ত হইয়াছিলেন।

নানা কারণে ঢাকার আশ্রমটী উঠিয়া গেল। উপাচার্য্য মহাশয় ঢাকায় ফিরিয়া আসিলে ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংশ্রব রাখিবার জন্য কতকটা যত্ন হইয়াছিল। কতিপয় প্রতিবাদী ব্রাহ্ম বলিতে লাগিলেন যে "যিনি কেশব বাবুর সঙ্গে সহানুভূতি রাখিবেন, তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করিতে পারিবেন না"। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এক সভা করিয়া বঙ্গবাবুকে বেদীচ্যুত করিলেন। এই সভাতে ঢাকার স্বনামখ্যাত উকীল বাবু আনন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি প্রধান প্রস্তাবকারী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সভার কার্য্যকলাপ দর্শনে কান্না পাইতে লাগিল। কান্দিতে কান্দিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম; প্রার্থনা করিলাম "প্রভো, এমন দিন কবে হইবে যে দিন আমরা পরিত্যক্তেরা এক খানি গৃহে নির্ব্বিঘ্নে তোমার পূজা করিতে পারিব"। কাঙ্গালের ঠাকুর আমার এ গুপ্ত কান্না শ্রবণ করিলেন এবং যথা সময়ে আমাদিগকে এক খানি উপাসনা মন্দির প্রদান করিলেন।

যখন আমরা পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের গৃহ হইতে তাড়িত হইলাম, তখন আমরা ভয়ানক প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত হইলাম।

বাহিরে ব্রাহ্মসমাজ ও জনসাধারণ আমাদের প্রতি বিরূপ হইলেন, কিন্তু কাঙ্গালশরণ সুযোগ পাইয়া আমাদিগকে ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিলেন। নির্জ্জন বন ও উদ্যান, সমাধিক্ষেত্র ও প্রান্তর আমাদের আশ্রয় স্থান হইল। শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, ঈশানচন্দ্র সেন, দুর্গানাথ রায় ও আমি প্রায় প্রতিদিন কোনো নির্জ্জন স্থানে উপাসনায় ধ্যানধারণায় নিযুক্ত হইতাম। কাঙ্গালের ঠাকুর নানা ভাবে নানারূপে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা আরাম ও শান্তি বিধান করিয়া ক্রমাগত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে জন সমাজ আমাদের নিকট এক প্রকার শ্মশানে পরিণত হইল। যখন সকলে বিমুখ হইল, তখন শ্রীহরি আমাদিগকে আশ্চর্য্য-রূপে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রদ্ধেয় বিহারীলাল সেন প্রচার ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনিও এ সময় উক্ত ভার ত্যাগ করিয়া চাকুরী পাইয়া আসাম চলিয়া গেলেন। তখন প্রচারক পরিবারের সেবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল। যাঁহারা এতকাল অর্থ দ্বারা প্রচারক পরিবারের সাহায্য করিতেছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ সাহায্য বন্ধ করিলেন। মহা দৈন্য দশা উপস্থিত, কোনো কোনো পরিবারে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল। এবার ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা যাই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কাশীপুরে পীড়িত অবস্থায় ছিলেন, একদিন তথায় তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।

৩রা আশ্বিন ভাই ঈশানচন্দ্র এবং আমি প্রচারার্থ মুন্সিগঞ্জ গমন করি। সেখানে দুই চারিটী বন্ধুসহ উপাসনা ও আলোচনাদি হইয়াছিল। ২৩শে আশ্বিন কয়েকজন বন্ধু মিলিত হইয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত আউটসাহী গ্রামে যাই, সেখানে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। ২৫শে আশ্বিন ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করি। সেদিন লক্ষ্মীপূর্ণিমা,

ঢাকার ঘাটে নৌকাতে বিশেষ ভাবে উপাসনা ও প্রসঙ্গাদি হইল। প্রসঙ্গের সময় ভগবানের মধুময় আবির্ভাব উপলব্ধি হইতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পরে আমার অন্তরে বড় অশান্তি উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল কোনো নির্জ্জন স্থানে কিছুদিনের জন্য চলিয়া যাই, কিন্তু তাহা হইল না। বিধাতা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিলেন। কার্ত্তিক মাসে অমানিশার উপাসনায় এক পক্ষ কালের জন্য নিশীথ ধ্যানের ব্যবস্থা হয়। নিশীথ উপাসনা যোগে ভগবানের বিশেষ প্রকাশে অন্তরের অশান্তি দূর হইয়া গেল।

এই বৎসর ফাল্গুন মাসে পবিত্রাত্মার ইঙ্গিতে পল্লীগ্রামে প্রচারার্থ একাকী গমন করি। গহনার নৌকায় পালরা যাই, রাত্রিতে অনাহারে নৌকায় বাস করি। শীতবস্ত্রাভাবে রাত্রিতে আর ঘুম হইল না। তৎপর দিন তিল্লি গ্রামে উপস্থিত হই। সেখানে কয়েকটি লোক মাঝে মাঝে একত্রে উপাসনা প্রার্থনা করিতেন, তাঁহাদিগকে লইয়া দুইদিন স্কুলগৃহে উপাসনা ও উপদেশ হইল। তথা হইতে কেদারপুর গ্রামে ভাই দুর্গানাথ রায়ের গৃহে গমন করি। দুর্গানাথ বাবু তখন সপরিবারে বাড়ীতে ছিলেন। সেখানেও কয়েকদিন উপাসনা, প্রার্থনা ও উপদেশাদি হইল। ১১ই ফাল্গুন ভাই দুর্গানাথের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারীর নামকরণ হয়। "পিতামাতা ঈশ্বর-ভক্ত ও প্রেমিকের ন্যায় শিশুসন্তানকে পালন করিবেন, যেন তাঁহাদের প্রেম-ভক্তির প্রভাব শৈশব কালেই সন্তানে সংক্রমণ করিতে পারে। পার্থিব সকল ব্যাপারে যেন আমরা ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করিতে পারি"—এই মর্ম্মে উপদেশ হইয়াছিল। এই গ্রামে হরিমোহন দত্ত নামে একজন ব্রাহ্ম এবং সনাতন বাউল নামে একজন বৃদ্ধ ভক্তিমান্ বাউল বাস করিতেন। তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে উপাসনাদিতে যোগদান করিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় পুনরায় তিল্লি গিয়াছিলাম।

১১ই চৈত্র ঘরে মাধ্যাহ্নিক উপাসনান্তে উপাচার্য্য মহাশয় এবং আমি রমনার মাঠে চলিয়া যাই। তিনি কৃত্রিম টিলায় ও আমি পর্টুগিজ কবরখানায় উপবিষ্ট হইলাম। ধ্যানের শেষ ভাগে ভগবদীঙ্গিতে টিলায় যাইয়া উপাচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ গ্রহণ করি। তিনিও ভগবানের দিকে তাকাইয়া এই মর্ম্মে উপদেশ দান করিলেন ঃ—"প্রিয় বৈকুণ্ঠ, যোগেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তোমাকে বিশেষ ভাবে কয়েকটী কথা বলিতেছি। তুমি বিশেষ ভাবে যোগ সাধনে নিযুক্ত থাকিবে। যোগের তিনটী অবস্থা—ধ্যান, ধারণা এবং সমাধি। ঈশ্বর সম্মুখে বর্ত্তমান, আমার অস্তিত্ব তাঁহারই মধ্যে, উর্দ্ধ অধঃ, সম্মুখ পশ্চাৎ সকল দিকেই তিনি ; কেবল তাঁহাকেই সার করিতে হইবে, ক্রমাগত তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে। এই তাকানই তাঁহার অভিমুখে উপবেশন, ইহাই অভ্যাস করিবে। প্রথমতঃ পাঁচ মিনিট, পরে দশ পনের মিনিট, ক্রমে অধিক ক্ষণ তাকাইতে অভ্যাস করিবে। উপাসনার সময় ব্যতীত অন্য সময়ও তাঁহার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিতে যত্ন করিবে। যাহা দেখিবে, সকলই তাঁহাতে, তাঁহা ছাড়া কিছুই থাকিতে পারে না এইটী হৃদয়ঙ্গম করিবে। ধ্যানের সময় কেবল তাঁহার পানে তাকান, আর অন্য সময় সকল বিষয় ব্যাপারে সংজড়িত ভাবে তাঁহাকে দর্শন, এই ভিন্নতা। ইহার একটী অপরটীকে সহায়তা করিবে। যতই গভীর ভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া তাঁহাতে মজিতে থাকিবে, ততই জীবনে সকল বিষয়ে তাঁহাকে দেখিবার সুবিধা হইবে। যতই জীবনে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে যত্ন করিবে, ততই ধ্যানেও অধিকতর গাঢ়তা হইবে। এইরূপে তাকাইতে তাকাইতে অন্তরে তাঁহাকে ধারণার অধিকার হইবে। ধারণার অবস্থায় দেখিবে, তিনি তোমাতে, তুমি তাঁহার প্রেম ক্রোড়ে। তুমি তাঁহাকে অন্তরে ধারণা করিতে থাকিবে, অপর দিকে

আপনাকে তাঁহাতে বিধৃত দেখিবে। ধারণার পরে সমাধি। সমাধিতে আর অন্য কোনও জ্ঞান থাকিবে না, কেবল তাঁহাকেই দেখিবে। আপনাকে ভুলিয়া তাঁহাতেই মজিয়া যাইবে।”

সেই দিন হইতে নির্জ্জনে সজনে ঐ প্রণালীতে কিছু দিন সাধন চলিল। আমি গান রচনা করিতে জানি না। তথাপি ভাবের আবেগে একদিন এইরূপ গাহিয়াছিলাম ঃ—

আহা কি সুন্দর ছবি, সখা হে তোমার ;
দেখিলে জুড়ায় আঁখি, আনন্দ অপার।
এমন মোহন রূপ আর কোথা দেখি নাই ;
বারেক দর্শনে প্রাণ আর কোথা মজে নাই।
এত যে সুন্দর রূপ আগে তাহা জানি নাই ;
অন্য রূপে মুগ্ধ হয়ে জীবন কাটিনু তাই।
এবে জানিলাম নাথ, তুমি সব সৌন্দর্য্যের সার,
প্রাণ যেন চির দিন থাকে মজে ওরূপে তোমার।

হিমাচল যাত্রা—তীর্থবাস।

অনেক দিনের সাধ ছিল, হিমাচল গমন করিব। ১৮৭৯ খৃঃ বৈশাখ মাসের প্রথমভাগে একদিন উপাসনায় এবিষয়ে প্রভুর অভিপ্রায় জিজ্ঞাসু হই, তিনি অনুমতি দান করেন। কোথায় কিরূপে যাইব, ইহার পরামর্শদাতাও আর কেহ নাই। কোনও বন্ধু এবিষয়ে সহানুভূতি করিবেন এ আশাও মনে স্থান পায় নাই। প্রভুর উপরই সকল নির্ভর। বাবু কালীমোহন ঘোষ নামক একজন ব্রাহ্ম দেড়াদুনে বাস করিতেন; তথায় কিছু দিন থাকিবার সুযোগ হয় কিনা জানিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। ভগবানের কৃপায় তিনি আমাকে কিছু দিন আশ্রয় দানে সম্মত হইলেন। আমি কালীমোহন

বাবুর সম্পূর্ণ অপরিচিত ; কোনও পদস্থ প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির পরিচয়-সূচক কি অনুরোধ পত্র তাঁহাকে দেই নাই। এই ঘটনাতে প্রভু তাঁহার দীন কিঙ্করের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিলেন।

হিমাচল যাত্রার সঙ্কল্প সভয়ে বন্ধুদিগকে জ্ঞাপন করিলাম ; তাঁহারা এবিষয়ে সহানুভূতি করিতে পারিলেন না। ভগবান একটী উপায় অন্তরে উপস্থিত করিলেন। "ইষ্ট" নামক সংবাদ পত্রের তাৎকালিক অধ্যক্ষ বাবু কালীনারায়ণ রায়ের নিকট প্রস্তাব করিলাম যে কলিকাতায় "ইষ্টে"র গ্রাহকদিগের নিকট হইতে মূল্য আদায় করিয়া দিলে তিনি আমায় পাথেয় সাহায্য করিতে পারেন কিনা। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কতকগুলি বিল ও হিসাব দিলেন। কিন্তু কলিকাতায় যাইব তাহারও তো পাথেয় সংস্থান নাই। বন্ধুবর কৈলাস চন্দ্র নন্দীর নিকট ছয়টী টাকা হাওলাত লইয়া কলিকাতা গেলাম।

১৮৭৯ খৃঃ বৈশাখ মাসে দেড়াহূন অভিমুখে যাত্রা করি। কলিকাতায় কয়েক দিন প্রচার কার্য্যালয়ে বাস করি। ঈশ্বর-কৃপায় "ইষ্ট" পত্রিকার মূল্য আশাতিরিক্ত রূপ আদায় হইল ; যে সকল লোক কাগজের মূল্য না দিয়া পত্রিকা গ্রহণে বিরত হইয়াছিলেন এবং মূল্য আদায়ের সম্ভাবনা ছিল না, এমন লোক হইতেও টাকা আদায় হইল। কালীনারায়ণ বাবু অতি সন্তোষ সহকারে আমাকে পঁচিশটী টাকা দান করিলেন। আমি কৃতজ্ঞ মনে যাত্রা করিলাম। পথে মোকামা, আরা, মোগলসরাই, লক্ষ্ণৌ, আলিগড় ও সাহারণপুর বিশ্রাম করিয়া ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শেষ রাত্রিতে দেড়াহূনে উপনীত হইলাম। সাহারণপুর হইতে দেড়ার পথে ক্ষুৎপিপাসায় বড় ক্লেশ হইয়াছিল। রজনী জ্যোৎস্না-ময়ী ছিল, দূর হইতে হিমাদ্রিশেখর নয়ন পথে নিপতিত হইল, বারম্বার যোগেশ্বরকে প্রণাম করিলাম, মনে ভারি উল্লাস হইল। পথ-কষ্টের সার্থকতা মনে হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে কালীমোহন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার পরিবারবর্গ আমাকে বিলক্ষণ আদর যত্ন করিয়াছিলেন। সেখানে একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ ছিল, ক্রমে ব্রাহ্মদের সঙ্গে পরিচয় হইল। বাবু গোপালচন্দ্র সরকার নামে জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সামাজিক উপাসনার কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহি। সুতরাং প্রথম রবিবার উক্ত বন্ধুই উপাসনা করিলেন। পর রবিবার হইতে আমার উপরে উপাসনার ভার অর্পিত হইল। প্রভু তাঁহার দাসের সেবাব্রত পালনের উপায় করিয়া দিলেন।

দেরাদুনের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। চারিদিকে পর্ব্বতমালা উন্নত-শিরে দণ্ডায়মান, মাঝে দেরা উপত্যকা; ইতস্ততঃ অনেকগুলি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী আছে, বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে উহাতে বড় জল থাকে না। ক্যানেলের জলই লোকে ব্যবহার করে, কেহ কেহ নির্ঝরবারি পান করিয়া থাকেন। দেরাদুন নগরের অনতিদূরেই নির্জ্জন গিরিকন্দর সকল আছে। ব্রহ্ম-সহবাস লাভ করিবার জন্য তাহারা নিরবে আহ্বান করিতেছে। ভগবান আমাকে নানা স্থানে লইয়া গিয়া নানা রূপে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার দুই চারি স্থানের বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

গুচ্ছপানী—দেরাদুনের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় তিন মাইল অন্তরে গুচ্ছপানী নামক নির্ঝর। প্রায় এক শত হাত নীচে নির্ঝরিণী-গর্ভে আমরা অবতরণ করিলাম। হিমগিরির অতি সুদৃঢ় প্রস্তরময় কটিদেশ বিদারণ করিয়া এই জল-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আমরা সেই বিদীর্ণ গিরি-গহ্বরে প্রবেশ করিলাম এবং কিয়দ্দূর যাইয়া দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রপাত দেখিতে পাইলাম। তাহারই এক স্থানে স্নানাদি করিয়া ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম, আরো দুইটী বন্ধু সঙ্গে ছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে লইয়া সমবেত উপাসনা হইল। পর্ব্বত-গহ্বরের

স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এবং জলপ্রপাতের গভীর নির্ঘোষ উদ্বোধনের সহায় হইল। উপাস্য দেবতা পরম ব্যক্তি রূপে প্রকাশিত হইয়া সকলকে কৃতার্থ করিলেন। উপাসনান্তে বন্ধুরা কিছু দূরে যাইয়া রন্ধনাদি করিলেন। আমি আরো কিছু কাল নির্জ্জনে প্রভুর চরণতলে বসিয়া রহিলাম। তৎপরে আহার করা গেল। প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু গোপাল চন্দ্র সরকার বলিলেন, সাধু অঘোরনাথ এই স্থানে আসিয়া ভগবানের অরূপ রূপ দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

তপকেশ্বর—তপকেশ্বর দেড়ার পশ্চিমে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে স্থিত। একটী মঠ আছে। নদী তটে দুইটী গুহা আছে। নদী পার হইয়া পাহাড়ে কিয়দ্দূর উঠিয়া গুহাতে যাইতে হয়। ২৩শে শ্রাবণ একাকী তপকেশ্বরে গমন করি। ক্ষুদ্র নদীর স্রোত এত প্রবল যে জলে নামিতে সাহস হয় না। দুই তিনবার নদী পার হইবার জন্য জলে অবতরণ করিলাম, কিন্তু উন্মাদিনী স্রোতস্বিনীর উল্লম্ফন দর্শনে ভীত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। পরিশেষে বহু কষ্টে নদী পার হইলাম। একটী গুহার দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইলাম, জন মানব নাই, জল-স্রোতের গভীর নিনাদে নির্জ্জনতার গাম্ভীর্য্য আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। চারিদিকে শূন্য দেখিতে লাগিলাম, প্রাণটা উদাস করিতে লাগিল। ভগবানের জন্য প্রাণ কান্দিতে লাগিল, প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রাণসখার প্রেমমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। এমনি প্রেমভরে তিনি আলিঙ্গন করিলেন, প্রাণ এক অপূর্ব্বভাবে মগ্ন হইয়া গেল। নয়ন উন্মীলন করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। বার বার তাঁহার চরণ-পদ্ম চুম্বন করিলাম, আর বক্ষে ধারণ করিলাম। সে চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কত আনন্দ হইল, কথায় তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলাম। বলিলেন— "তোমার প্রাণ মুগ্ধ করিবার জন্য, প্রেমেতে মত্ত করিবার জন্য তোমাকে

এদেশে আনয়ন করিয়াছি।” আহা, প্রেমময়ের শ্রীমুখের কথা কি সুমিষ্ট !!

দেড়াডুনের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ নদীগর্ভ—স্মৃতিপুস্তক হইতে উদ্ধৃত :— সুপ্রশস্ত নদী বক্ষে এক খণ্ড শিলোপরি উপবিষ্ট হইলাম। সম্মুখ পশ্চাৎ বাম দক্ষিণ দিয়া সোঁ সোঁ শব্দে জল-স্রোত বহিয়া যাইতেছে। পার্ব্বত্য নদীর গভীরতা অল্প কিন্তু বেগ অতি খরতর। সম্মুখে বিস্তীর্ণ উপলক্ষেত্র, তৎপর হরিৎ শস্যক্ষেত্র, তার পর শালবন, তার পর উন্নত-গ্রীবা পর্ব্বতশ্রেণী শোভা পাইতেছে। সম্মুখে যে জল-প্রবাহ কলকল নাদে বহিয়া যাইতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“পবিত্র-সলিলে, স্বর্গের ঈশ্বর গিরিশেখর হইতে তোমাকে নিম্ন ভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। স্বর্গের কত সুসমাচার লইয়া তুমি মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছ! তুমি অতি পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলোকে ছিলে, স্বর্গের দেবতা তোমাকে আকাশে তুলিয়া লইলেন, সেখানে তোমাকে লইয়া তিনি কত লীলা খেলা করিয়া আকাশ-স্পর্শী হিমাদ্রিশেখরে তোমাকে ঢালিয়া দিলেন, —পরিশেষে তুমি নিম্নদেশে প্রেরিত হইয়াছ। কত দুঃখী-তাপীর জন্য সুসমাচার, কত তৃষিত আত্মার জন্য অমৃতবারি লইয়া আসিয়াছ তাহা কে বলিতে পারে? বল দেবি, আমার জন্য কি সংবাদ আনিয়াছ? স্বর্গেশ্বর তোমার সঙ্গে আমার জন্য কি তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন, বলিয়া যাও। তোমার কার্য্যভার গুরুতর—তজ্জন্য দৌড়িয়া চলিয়াছ; কত লোককে কত কথা বলিতে হইবে, কত দেশের পবিত্রতা ও উর্ব্বরতা সম্পাদন করিতে হইবে। বুঝিলাম, তুমি আমার জন্য তিষ্ঠিতে পার না; কিন্তু তোমার গতিরোধ না করিয়াই আমাকে কিছু বলিয়া যাও।” সেই সুভাষিণী স্রোতস্বতী সুগম্ভীর ভাবে আমায় বলিয়া গেল, “আমার জীবন দৃষ্টে স্বর্গের তত্ত্ব শিখিয়া লও, আর যদি চক্ষু থাকে আমার বক্ষে স্বর্ণাক্ষরে যে উপদেশ বাক্য লেখা রহিয়াছে, তাহা পাঠ কর, আমার

আর বলিবার সময় নাই।" অনেক ক্ষণ নদীর পাছে পাছে দৌড়িলাম, কিন্তু সে আর আমায় কোনও কথা বলিল না। আমি প্রার্থনা সহযোগে চিন্তামগ্ন হইলাম, অন্তশ্চক্ষুর সমক্ষে এই সকল তত্ত্ব প্রকাশ পাইল। প্রথমতঃ সলিল সমুদ্র-বক্ষে স্বজন-পরিবেষ্টিত হইয়া উল্লাসে ক্রীড়া করিতেছিল, বিশ্বপতি তাহাকে বাষ্প-কণার আকারে বৈরাগ্যের অকিঞ্চিৎকর বেশে আকাশে তুলিয়া লইলেন, স্বজনবর্গ হইতে তাহার বিচ্ছেদ হইল। আকাশে তুলিয়া তাহাকে লইয়া নানারূপ লীলাখেলা করিয়া পৃথিবীর সেবাব্রতে দীক্ষিত করিলেন। এমন স্থানে তাহাকে নিক্ষেপ করিলেন, যে স্থান হইতে সে বহুলোকের উপকার করিতে পারিবে। সলিল অকুণ্ঠিতভাবে স্রষ্টার ইচ্ছা পালন করিতে লাগিল, অগণ্য বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া উন্মাদ-বেগে তাঁহার আদেশ পালন করিতে লাগিল, অপ্রতিহতভাবে আপন ব্রত উদ্‌যাপনে নিযুক্ত হইল। আপনার জন্য কিছুই রাখিল না, আপনাকে পৃথিবীতে বিলাইয়া দিল।

সারমর্ম্ম—প্রভু যখন ডাকিলেন, সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁহার নিকট গেলাম, যাহা শিখাইবার শিখাইলেন, যখন জন-সমাজের সেবার জন্য প্রেরণ করিলেন, অম্লানবদনে তাহাতে নিযুক্ত হইলাম। ধর্ম্ম জীবন আপনার জন্য নহে, কিন্তু মানবজাতির জন্য।

বারম্বার পরম প্রভুর আশ্বাসবাণী শুনিয়াও পাপ প্রলোভনে পড়িয়া অনেক সময় আঁধার দেখিয়াছি এবং তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিয়াছি। ৯ই ভাদ্র তাঁহার নিকট নিম্নলিখিতরূপ প্রার্থনা করি ও উত্তর পাই।

প্রার্থনা—"হে দীনবন্ধো, কতবার তুমি আশ্বস্থ করিলে, মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার করিলে, কিন্তু তাহাতেও নির্ভয় হইতে পারিতেছি না। পাপ প্রলোভনের নিকট আমি তৃণের ন্যায় বিধ্বস্ত হই। প্রভো, আমার এ দুর্দ্দিন কি ঘুচিবে না?"

উত্তর—"সন্তান, তোমার দুর্দ্দিন নিশ্চয়ই ঘুচিবে। তোমার পরিত্রাণের জন্য আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছি, তোমাকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইতেছি।"

প্রার্থনা—"পিতা, তোমার কথায় আশ্বস্ত হইলাম। তুমি আমার কেশে ধরিয়া রহিয়াছ ইহা যেন কখন না ভুলি।"

১১ই ভাদ্র জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নিম্নলিখিতরূপ প্রার্থনা হইয়াছিল। "হে প্রেমময় দেবতা, তোমার প্রেম দেখিয়া অবাক হইলাম। সুবিমল শারদীয় চন্দ্রালোকে তোমার প্রেমের ছটা কি মিষ্ট! আহা, প্রাণ যে ভাবরসে উথলিয়া উঠিতেছে। সুস্নিগ্ধ চন্দ্র-কিরণে তোমার কি সুন্দর প্রেমের ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। চন্দ্রিকে, তুমি আজ আশ্চর্য্য প্রেমের শাস্ত্র প্রচার করিলে। প্রেমময়, এইজন্য কি চন্দ্রের সৃষ্টি, উদাস প্রাণ মোহিত করিবার জন্য? হে নাথ, তোমার প্রেমের ফাঁদে না পড়িয়া থাকা কঠিন। তুমি সকল স্থানে প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছ। ঐ সুস্নিগ্ধ শশীতারায়, ঐ সুন্দর সুগন্ধ বনকুসুমে, এই আমার প্রাণের ভিতরে প্রেমের জাল পাতিয়া বসিয়া আছ। এই সামান্য মাছ ধরিবার জন্য তোমার এত ফন্দি কেন? আমি বড় শেয়ানা মাছ, জাল কাটিয়া বারবার পলায়ন করিয়াছি, তাই বুঝি এবার নানা স্থানে জাল পাতিয়াছ। তুমি ভাল ধীবর, তবে আমায় ধর। এমন করিয়া ধর, যেন আর পালাবার উপায় না থাকে। ধন্য দেব তোমার প্রেম!"

দেড়াতুন অবস্থান সময়ে দুইবার মশুরী পাহাড়ে গমন করি। ঋষিদের প্রিয় নিকেতন হিমাচল শিখরে বসিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইবার সাধ ছিল, ভগবান সে সাধ এ যাত্রায় পূর্ণ করিলেন। পাহাড়ে নির্জ্জনতার অভাব নাই; নানাস্থানে নানাভাবে ভগবান কৃতার্থ করিলেন। একদিন একাকী মশুরীর প্রায় ৫।৬ মাইল দূরবর্ত্তী

গুমত্তিপানী (Comtee Fall) নামক জলপ্রপাত দেখিতে যাই। নির্জ্জন বনের ভিতর দিয়া রাস্তা, পথে জন মানবের সঙ্গে ক্বচিৎ সাক্ষাৎ হইল। অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে বারিরাশী নিম্নে পতিত হইতেছে, তাহারই অপর পারে বসিয়া উপাসনা করিলাম। উপাসনান্তে রুটি দ্বারা মধ্যাহ্ন ভোজন করা গেল। দিবাবসানে বাসায় ফিরিলাম। দেড়াহুনে ও মশুরীতে কোন কোন দিন সমস্ত দিনের জন্য কোথাও নির্জ্জন স্থানে চলিয়া যাইতাম, উপাসনা ধ্যান ধারণায় দিন কাটাইয়া সায়ংকালে বাড়ী ফিরিতাম। ছাতু কিম্বা রুটী দ্বারা মধ্যাহ্ন-ভোজন হইত।

কার্ত্তিকমাসে দেড়াহুন ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইল। তৎপর দেশে ফিরিতে হইবে, কিন্তু পাথেয় সংস্থান নাই। ভগবানই কাঙ্গালের সকল ভার বহন করেন, তিনিই স্বযোগ করিয়া দিলেন। ডেপুটীকালেক্টর বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় সেখানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তিনি কতক ব্যয় নিজে বহন করিলেন এবং কতক টাকা হাওলাত দিলেন। পার্ব্বতীবাবুর সঙ্গে দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আসি।

সেই সময়ে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সদলে বিহার অঞ্চলে প্রচার যাত্রা করেন। "রবিবাসরীয় মিরার" পত্রিকায় তাঁহাদের প্রচারবিবরণ পাঠ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইবার সাধ আমার মনেও প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু স্বযোগাভাবে যথা সময়ে আসিয়া জুটিতে পারিলাম না। শেষ দিন বাঁকিপুরে তাঁহাদের সঙ্গে বাষ্পীয়শকটে মিলিত হই। পরদিন প্রাতে মোড়পুকুর সাধনকাননে উপাসনা ও গ্রামে কীর্ত্তন হয়। অপরাহ্নে শ্রীরামপুরে গঙ্গাপার হইয়া ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়েতে শিয়ালদহে পৌছান যায়। কলিকাতার বন্ধুরা মহাঘটা করিয়া প্রচারযাত্রীদলকে অভ্যর্থনা করেন। প্রচারযাত্রীদল বস্ত্রাদি উপহার

পাইয়াছিলেন। উহার একখণ্ড আমাকেও প্রদত্ত হইল। আচার্য্যদেব বলিলেন "তোমরা সমস্ত দিন খাটিয়া যাহা পাইলে, বৈকুণ্ঠ শেষ বেলায় আসিয়াও তাহাই পাইলেন।" প্রচার যাত্রার একবিন্দু প্রসাদ পাইয়াই আমি কৃতার্থ হইলাম। ইহার পরবর্ত্তী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মাঘোৎসবে নববিধান বিঘোষিত হয়। নববিধান ঘোষণাকালে প্রেরিত ভাই বঙ্গচন্দ্রের সঙ্গে ঢাকার প্রচারকদল—ভাই দুর্গানাথ রায়, ঈশানচন্দ্র সেন, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র নন্দী, দীননাথ কর্ম্মকার, ও চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার নববিধান প্রচারকরূপে ঘোষিত হন।

ঢাকার কার্য্যালয়।

"ইষ্ট" আফিসে বসিয়াই আমরা কাজ কর্ম্ম করিতাম। "ইষ্টে"র কর্ম্মাধ্যক্ষতা আমার উপর ছিল। বঙ্গবন্ধুর কার্য্যনির্ব্বাহ ও প্রচার ভাণ্ডারের ভারও তখন আমার উপর। কুচবিহার বিবাহে "ইষ্ট"পত্র প্রতিবাদকারী দলে মিশিয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন বলিয়া আমি "ইষ্টে"র সঙ্গে সংশ্রব পরিত্যাগ করি। তখন আমাদের একটী স্বতন্ত্র কার্য্যালয়ের অভাব বোধ হইতে লাগিল। ডাক্তার দুর্গাদাস রায় মহাশয় তখন নয়াবাজার বাস করিতেন। তাঁহার বাস ভবনের নিম্নতলস্থ বাহিরের বারাণ্ডা কার্য্যালয়ের জন্য চাহিয়া লইলাম। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র নন্দী হইতে একখানা ভাঙ্গা টেবল চাহিয়া আনিলাম। ছোট ছোট দুই তিনখানা টুল ক্রয় করিয়া লইলাম। এই সরঞ্জাম লইয়া আফিস খোলা হইল। প্রতিদিন মধ্যাহ্ন সময়ে আহারান্তে তথায় পরম প্রভুর শরণাপন্ন হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতাম। অন্যান্য বন্ধুরাও অনেক সময় সেখানে যাইয়া বসিতেন ও কাজ কর্ম্ম করিতেন।

দুর্গাদাস বাবুর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য তাঁহারই বাড়ীতে

একটী ছোট খাট স্কুল হইল। আমিও স্কুলে দুই তিন ঘণ্টা শিক্ষা দান করিতাম। স্কুলের কার্য্য প্রার্থনা সহযোগে আরম্ভ হইত। এই বিদ্যালয় ক্রমে মাইনার তৎপর ঢাকা মডেল এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত এই স্কুলের সঙ্গে আমার কোনও না কোনও রূপ সংশ্রব ছিল।

প্রচার কার্য্যে নবোদ্যম।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত হইয়া আমরা প্রথমতঃ প্রতি রবিবার প্রাতে রামপ্রসাদ বাবুর বাসায় সামাজিক উপাসনা করিতাম। সায়ংকালে আর একত্রে উপাসনা হইত না। অনেক দিন পরে বুধবার সায়ংকালে দুর্গাদাস বাবুর বাসায় সামাজিক উপাসনা হইত। পরে বুধবার উপাসনার পরিবর্ত্তে রবিবার সায়ংকালে সামাজিক উপাসনা হইত। তখন আমরা গরিব ভাবে বিনা আড়ম্বরে উৎসবাদি সম্ভোগ করিতাম। বাহিরের আড়ম্বর হীন অবস্থায় আমাদের অন্তরেরও দীনতা বৃদ্ধি হইয়াছিল। ভগবানও সেই সুযোগে দীনাত্মাদের অন্তরে তাঁহার স্বর্গের সৌভাগ্য বিধান করিতেন। এইরূপে কিছু দিন চলিয়া গেল। নির্জ্জন বাস, অজ্ঞাত বাস এক প্রকার শেষ হইয়া আসিল। গোপনে নির্জ্জনে প্রভু তাঁহার দাস-দিগকে নানা রূপ শিক্ষা দান করিয়া প্রকাশ্যে তাঁহার মহিমা প্রচারে প্রবৃত্ত করিলেন। ক্ষুদ্র মণ্ডলীর অন্তরে প্রভুর সাক্ষ্য দানের জন্য এক নূতন প্রত্যাদেশ প্রকাশ পাইল। পূর্ব্ববাঙ্গালায় প্রচারের এক নবযুগ আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথমে বাবুরবাজার নদীর পারে মেডিকেল স্কুলের প্রাঙ্গনে সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। চারিদিকে পতাকা প্রোথিত করিয়া মাঝখানে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইল।

ভগবানের বিশেষ আহ্বানে দলে দলে লোক আসিয়া উহা শুনিতে

লাগিল। যে সকল লোককে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতাদি শুনিতে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারাও অনেকে আসিলেন, সম্ভ্রান্ত ও অপর সাধারণ বহুলোক দণ্ডায়মান অবস্থায় ভগবানের এই লীলা সন্দর্শন করিলেন।

ইহার অল্প কয়েক দিন পরে ১৮০২ শকে ৭ই জ্যৈষ্ঠ ঢাকা হইতে প্রথম প্রচার যাত্রা বাহির হয়। উক্ত দলে উপাচার্য্য মহাশয়, শ্রদ্ধা-ভাজন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ঈশানচন্দ্র সেন, দুর্গানাথ রায়, দীননাথ কর্ম্মকার এবং আমি ছিলাম। নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত মণ্ডলীর আরো অনেকে গমন করিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জে বিশেষ মত্ততার সহিত কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইল। তথাকার অনেকে প্রভূত উৎসাহ সহকারে কীর্ত্তনে যোগ দান করিয়াছিলেন। যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। এই যাত্রায় নারায়ণগঞ্জ, পাঁচদোনা, মাত্রা, কালীগঞ্জ, হুসেনপুর কিশোরগঞ্জ, জঙ্গল বাড়ী এবং ময়মনসিংহে বিশেষ ভাবে প্রচার হয়। প্রচার যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিলে সকলেরই অন্তরে নূতন আশা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। তখন বিধিমত আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইল এবং বিশেষরূপে প্রস্তুত হইয়া ২৮শে ভাদ্র বিশেষ উৎসব সহযোগে "ভারতবর্ষীয় শাখা ব্রাহ্মসমাজ" নামে আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। সমস্ত দিন জমাট উৎসব সকলে সম্ভোগ করিলেন। সমাজ মণ্ডলীর কোনও কোনও সভ্যকে কোনও কোনও কার্য্যের ভার প্রদান করিলেন। আমাকে যোগ সাধন করিয়া মণ্ডলীর সেবা করিবার ভার এবং অন্যতর সহকারী সম্পাদকের কার্য্যভার প্রদত্ত হইল।

ঢাকাতে ভগবল্লীলা ব্যাপারে এক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর জীবনকে একীভূত ভাবে ভগবান ব্যবহার করিয়াছেন, সে ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিতে গেলে পুঁথি অনেক বাড়িয়া যায়, তাই প্রধান প্রধান কোনও

কোনও ঘটনার মাত্র উল্লেখ করিয়া যাইব। প্রভুর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে, ঢাকায় আসিয়া প্রচার কার্য্যে যোগ দিবার পূর্ব্বে আমার জীবনে বিলক্ষণ জড়তা ও আলস্য ছিল। স্ফূর্ত্তি অতি অল্পই লক্ষিত হইত। বন্ধুরাও আমাকে অকর্ম্মা লোক বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু ঢাকায় আসিয়া ভগবান এই জড়তাগ্রস্ত, অলস-প্রকৃতি অকর্ম্মা লোককে নানা কার্য্যে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কখনও সজন নির্জ্জন উপাসনা, কখনও প্রচারক পরিবারের তত্ত্বাবধান, কখনও পত্রিকাদি পরিচালন, কখনও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান নানাবিধ কার্য্যে তিনি এই তৃণকে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বাহিরের কার্য্য করিবার জন্য তখন অপর কোনও লোক তেমন ছিলেন না, সুতরাং একাকী অধিকাংশ বৈষয়িক ব্যাপারে আমাকেই নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। ভগবান এই অপদার্থ লোককে বিবিধ প্রকারে ব্যবহার করিয়া শিক্ষা দিলেন, যে তৃণকেও তিনি আপনার হাতে পাইয়া কেমন ব্যবহার করিতে পারেন, নিতান্ত অকর্ম্মাকে কর্ম্মঠ করিতে পারেন, অলস ও জড়কে উদ্যমশীল ও উৎসাহী করিতে পারেন। তখন আর কাজ করিতে হটিতাম না। প্রভুর যাহা কার্য্য শরীর মন প্রাণ দিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলাম।

স্মৃতিপুস্তক—১৮০৩ শক ১লা ভাদ্র প্রাতে ব্রহ্ম সত্তার প্রেম জলধিতে স্নান করিলাম, অমৃতময় অগাধ ব্রহ্মসত্তা সাগরে সন্তরণ করিলাম, অবগাহন করিলাম। ভগবান এইরূপে আমাকে অভিষিক্ত করিয়া উপাসনা গৃহে লইয়া গেলেন। ৮ই আশ্বিন সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মরূপ প্রকাশিত হয়। বিক্ষিপ্তমনা ব্যক্তির যোগ হয় না। বিক্ষিপ্ত চিত্ত মলিন কাঁচের ন্যায়, উহাতে ব্রহ্মরূপ প্রতিফলিত হয় না। চিত্তের স্থিরতার জন্য আত্মরুচি, বাসনা, কামনা, স্বেচ্ছার উচ্ছেদ প্রয়োজন। জীবনের সকল বিষয়ে স্থির বন্দোবস্ত চাই। জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন স্থিরতা আপনার

হাতে নাই, আপনাকে ভগবানের হাতে সম্যক ন্যস্ত করিলে চিত্ত স্থির, জীবন স্থির হইতে থাকে।

১৫ই ফাল্গুন, প্রার্থনা—"হে ঠাকুর, হে প্রভো, দাসের জীবনের সমুদয় ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছ, জীবনের পরীক্ষায় ইহা দেখিয়াছি। এখন আর আমার জীবনের জন্য ভাবিত হইব না, তোমার সিংহাসন যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় আমার সেই যত্ন হউক।"

সমাজ প্রতিষ্ঠার পর মণ্ডলীর কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইতে লাগিল ও ১৮০৩ শকে "ইষ্টে"র দুইজন অংশীদার শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় ও শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নন্দীর মধ্যে ঘোরতর বিরোধ হয়, এবং তাঁহারা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাবজজের অনুমতিক্রমে তাঁহারা আপোষে মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় ও আমি তাঁহাদের প্রেস বণ্টন করিয়া দি। "ইষ্ট" ও প্রেসে লাভ হইত না, কালীনারায়ণ বাবু খাটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। হঠাৎ তাঁহার স্থানান্তরিত হইবার সময় আমি অন্যত্র ছিলাম। তিনি "ইষ্ট" ও প্রেসের ভার বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ রায়ের উপর রাখিয়া চলিয়া যান। তাঁহারাও কালীবাবুর কিঞ্চিৎ ঋণ বৃদ্ধি করেন ও অসাবধান লেখার জন্য রাজদ্বারে অর্থদণ্ড দেন। পূজার বন্ধে কালীবাবু ঢাকায় আসিয়া আমার হাতে "ইষ্টে"র ও প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষতার ভার দেন ও আমাদেরই তত্ত্বাবধানে বাবু শশীভূষণ রায়ের উপর সম্পাদকের ভার অর্পিত হয়। তখনই "ইষ্ট" ও প্রেস আমাদের মণ্ডলীর হাতে লইবার কথা হয়। কার্য্যাদি সম্বন্ধে আমারই যাহা কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং আমারই উপর সমস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত হইতে লাগিল। যখন প্রেসটী লওয়া হয় তখন উহার অক্ষরাদির নিতান্ত অভাব ও অকর্ম্মণ্য অবস্থা। এক এক ফরমার বেশী ছাপা হইতে পারিত না। অনেক ক্লেশে

রাত্রি জাগরণ করিয়া কাগজ বাহির করিতে হইত। ঐ শকের পৌষ মাসে "ইষ্ট" ও প্রেস ক্রয় করা হয়। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ রায় এই দুই জনের নামে প্রেস কেনা হয়। প্রেস কিনিবার পর খাটুনি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। শশীবাবুও খুব খাটিতেন। "ইষ্ট" ও "বঙ্গবন্ধু" ছাপিয়া প্রেসে বাহিরের লোকের জবওয়ার্ক করা যাইত। এক বৎসরে "ইষ্ট" ও প্রেসের আয় হইতে অক্ষরাদি সমস্ত নূতন করা গেল। সরঞ্জামের আর অভাব রহিল না। যে "ইষ্টে"র বার্ষিক আদায় ১৬।১৭ শতের অধিক হইত না, প্রথম দুই বৎসরে প্রায় ২৩০০।২৪০০্ টাকা আদায় হইল। প্রেসেরও আয় বৃদ্ধি হইল, কার্য্য এত বাড়িয়া গেল যে দ্বিতীয় বৎসর আর একটী প্রেস সরঞ্জাম সহ ১০৫০্ টাকায় ক্রয় করা হইল এবং সমস্ত টাকাই প্রেস ও "ইষ্টে"র আয় হইতে দেওয়া গেল। প্রচার ফণ্ডেও কতক নিয়মিত সাহায্য হইতে লাগিল। সম্পাদকের বেতন ও মূলধনের স্থদ নিয়মিতরূপে দেওয়া হইল। সাচিপান্দরিপা দেওয়ান সাহেবের হাবেলিতে নীচের একটী সঙ্কীর্ণ গৃহে প্রেস ছিল, বাজারে একটী ক্ষুদ্র গৃহে অক্ষরাদি রক্ষা ও আফিস করা গেল। একদিন মনে আছে, বাঙ্গালা ও মাইনার পরীক্ষার প্রশ্ন ছাপা হইতেছিল। এ প্রশ্ন ছাপার জন্য ১০০০্ টাকার গ্যারাণ্টি দিতে হইত, যেন কোনরূপে উহা প্রকাশ না হয়। কয়েক হাজার ছাপা হইল, কিন্তু রাত্রি ১২টা পর্য্যন্তও ছাপা শেষ হইল না; শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী যাঁহারা প্রহরী ছিলেন, তাঁহারা আমার উপর সমস্ত ভার রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমি সমস্ত দিন সঙ্গে ছিলাম। রাত্রিতে সেই দুর্গন্ধময় সঙ্কীর্ণ গৃহে প্রহরী থাকিয়া ছাপা করাইতেছি; রাত্রি তিনটার সময় প্রেসম্যান প্রভৃতি অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহাদিগকে ঘুমাইতে দিলাম। আমি মুদ্রিত কাগজ ও প্রেসের উপর শয়ন করিলাম, নিদ্রা হইল না। মশকের

ভয়ানক দংশন। সময়ে সময়ে অতি ক্লেশে কাজ করিতে হইত। কিন্তু ক্লেশ বোধ ছিল না। যখন প্রেস লাভজনক ব্যাপার হইল, ইস্‌লামপুরে বড় রাস্তার ধারে একটী প্রশস্ত গৃহ ভাড়া করিয়া কতক অংশে প্রেস, মাঝের হলে সমাজ ও অন্য অংশে উপাচার্য্য মহাশয়ের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই গৃহে উপাসনা ও উৎসবাদিতে সমাজের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই গৃহে পরমেশ্বর মল্লিক বিধাতার প্রেমের জালে নিবদ্ধ হন, তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই বাড়ীতে অনেক গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হয়। এটি দ্বিতল গৃহ, ছাদে যাইয়া উপাসনাদি করা যাইত। এখানে এক দিন "ইষ্ট" ও প্রেসের পক্ষ হইতে কর্ম্মচারী, সহানুভূতিকারী ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিদিগকে এক মহা প্রীতি-ভোজন দেওয়া হইত। বন্ধুরা অনেকেই অবসর সময়ে এখানে মিলিত হইয়া নানারূপ প্রসঙ্গ করিতেন। এই বাড়ীর সম্মুখেই কমলা লেবু ও আমের দোকান সকল সজ্জিত থাকিত, অনেক সময় বন্ধুদিগকে কমলা ও আম দ্বারা সেবা করা যাইত। বস্তুতঃ এটি একটি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের ক্ষেত্র, উপাসনা সৎপ্রসঙ্গের স্থল, আমোদ আহ্লাদের গৃহ হইল। প্রভু আমাকে এসকল ব্যাপারে আশ্চর্য্যরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তখন মহা কর্ম্মোত্তম, কিন্তু সকলই প্রভুকে ও তাঁহার বিধানকে মহিমান্বিত করিবার জন্য। এই সময়ে আমি কিছুদিন শ্রীযুক্ত গোপী-কৃষ্ণ সেন মহাশয়ের বৈঠকখানায় শয়ন করিতাম। একদিন রবিবার সামাজিক উপাসনার পরে আহারান্তে বিছানায় বসিয়া কার্য্যালয়ের হিসাব লিখিতেছি, হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, বাতিটি পড়িয়া গিয়া কতক কাগজ-পত্র পুড়িয়া গিয়াছে; ফর্স বিছানার সতরঞ্চের এক দিক হইতে অপর দিক পুড়িয়া যাইতেছে। শেষ রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া বাহিরে গিয়াছি, পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিয়া শুইতে যাইবার

সময় আগুন দেখিলাম, দিয়াশলাই জ্বালিলাম। করুণাময়ী মা আমাকে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিয়াছেন। আমি নিদ্রিত ছিলাম, তিনি জাগ্রত থাকিয়া আমার দুই দিকের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছিলেন, আমার গায়ে একটুও তাত লাগে নাই। পাছে ঘুম ভাঙ্গে, তাই আস্তে আস্তে আগুন নিবাইতেছিলেন। তিনি রক্ষা না করিলে সেই দিনই জীবন্ত দগ্ধ হইয়া যাইতাম। কেননা সমস্ত দিন খাটিয়া শরীর অবসন্ন হইয়া ঘুম হইয়াছিল। ভয় হইয়াছিল সতরঞ্চ পুড়িয়াছে দেখিয়া গোপীবাবু রাগ করিবেন, কিন্তু তিনি রাগেন নাই। ইহাও আমার সৌভাগ্য।

স্মৃতিপুস্তক—১৬ই চৈত্র ১৮০৩ শক—"হে সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর, তুমি সর্ব্বত্র সমভাবে আছ, তবে কেন আমি তোমাকে দেখিতে পাই না?" "রে জীব, তুই আমার পানে তাকাস্ না, তাই আমাকে দেখিতে পাস্ না, তুই অশুচি হইয়া পড়িস্ আর আমি অন্তর্হিত হই।"

১৮০৪ শক আষাঢ়—চাওয়াতে ও পাওয়াতে প্রভেদ নাই। আমি আজ কিছু চাহিয়া রাখিলাম, কাল তাহা পাইব, ইহা চাওয়া নহে। চাহিব এবং পাইব। ঈশ্বরকে চাওয়াতে এবং পাওয়াতে ব্যবধান নাই। সূর্য্যোদয়ে ঘরের দ্বার খুলিলেই যেমন আলোক দেখিতে পাই, তেমনই হৃদয়-দ্বার—অন্তরের চক্ষু খুলিলেই আমরা পরমাত্মাকে দেখিতে পাই। হৃদয়দ্বার যতক্ষণ বন্ধ রাখি ততক্ষণ অন্ধকার। হৃদয় ভগবানের দিকে উন্মুখী করাই চাওয়া। হৃদয়দ্বার খোলা পাইলেই তিনি তন্মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করেন।

যখন ব্রহ্মদর্শন হয় নাই, তখন সঙ্গীত করিয়া, মুখে প্রার্থনা করিয়া, উপাসনা পুস্তক পাঠ করিয়া ব্রহ্মদর্শনের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। যখন ব্রহ্মদর্শন লাভ হইল তখন দেখিতে

লাগিলাম, যখনই সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার পানে তাকাই তখনই তিনি সম্মুখে উপস্থিত হন।

প্রচার।

১৮০৪ শকের পৌষমাসে পবিত্রাত্মা দ্বারা বিশেষভাবে পরিচালিত হইয়া চট্টগ্রামে প্রচারযাত্রা করা হয়। উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, দুর্গানাথ রায়, দীননাথ কর্ম্মকার, মহিমচন্দ্র সেন, অন্নদাপ্রসন্ন সেন, দীননাথ সেন, পরমেশ্বর মল্লিক ও আমি দল বাঁধিয়া তথায় গমন করি। বঙ্গোপসাগরের কিনারা ঘেঁসিয়া নৌকাযোগে যাওয়া হয়। চট্টগ্রামে কয়েকদিন জমাট উৎসব হয়। উৎসবান্তে চট্টগ্রামস্থ পণ্ডিত রাজেশ্বর গুপ্ত এবং কৈলাসচন্দ্র দাস ম্যানেজার প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুগণসহ প্রচারযাত্রীদল বাড়বকুণ্ড, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে পাহাড়ে ও জনপদে উপাসনা, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও প্রসঙ্গাদি দ্বারা প্রচার করেন। সহস্রধারা হইতে চট্টগ্রামের বন্ধুরা গৃহে ফিরিয়া গেলেন, ঢাকার প্রচারযাত্রীদল মিরেশ্বরী, ফেণী, দেওয়ানগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম ও মুরাদনগর প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া ঢাকাতে প্রত্যাগত হন। চট্টগ্রাম হইতে কুমিল্লা পর্য্যন্ত গোযান, তৎপর নৌকায় আসা হয়। এ প্রচার যাত্রা খুব জমাট হইয়াছিল। তৎপর মাঘোৎসবে কলিকাতা যাই। সেখানে কয়েকদিন উৎসব ভোগ ও প্রেসের সরঞ্জামাদি ক্রয় করিয়া ঢাকায় আসি।

১০ই চৈত্র ঢাকা রমনা মাঠে প্রতাপচন্দ্র দাসের উদ্যানে এবার বসন্তোৎসব হয়। এই দিন ভগবান তাঁহার সুন্দর পুরুষরূপ—পরম-পতিরূপ আমার নিকট বিশেষভাবে প্রকাশ করেন এবং অনুজ্ঞা করেন "বরিশাল অঞ্চলে যাইয়া আমার সাক্ষ্য প্রদান কর"। অপর একজন সঙ্গী লইবার জন্যও ইঙ্গিত হইল। মণ্ডলীর নিকট তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। তখন সমাজ, প্রেস ও "ইষ্ট" সম্পর্কিত অধিকাংশ বৈষয়িক কার্য্য আমার হস্তে। প্রায় এক মাস কাল বৈষয়িক

ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিতে চলিয়া গেল। ভাই দুর্গানাথ রায় বরিশাল যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

১৮০৫ শকের ১৩ই বৈশাখ যাত্রার দিন ধার্য্য হইল। পূর্ব্বরজনীতে মণ্ডলীর উপাসকগণ বিশেষভাবে সমাজ গৃহে সমবেত হইয়া বিদায়-সূচক উপাসনা করেন। উপাসনান্তে "পবিত্রাত্মা" নামাঙ্কিত একটী পতাকা আমার হাতে এবং ভাই দুর্গানাথের হাতে ভিক্ষার ঝুলি প্রদত্ত হইল এবং নগরের ব্রাহ্মপরিবার সকলকে পবিত্রাত্মার অবতরণ সংবাদ দান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল। তদনুসারে আমরা দু'ভাই বাড়ী বাড়ী যাইয়া পবিত্রাত্মার অবতরণ বার্ত্তা প্রদান করি। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় আমরা গৃহে প্রত্যাগত হই। পরদিন অতি প্রত্যূষে আমরা গোয়ালন্দ জাহাজে যাত্রা করি। বিশ্বাসী মণ্ডলীর অধিকাংশ লোক আমাদিগকে বিদায় দিবার জন্য জাহাজ ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পবিত্রাত্মা স্বয়ং আমাদের নেতা হইয়া চলিলেন। বন্ধুদের সহযোগে আমাদের ঝুলিতে কিঞ্চিৎ পাথেয় প্রদত্ত হইল। মধ্যাহ্নে আমরা জাহাজে উপাসনা করিলাম এবং কিঞ্চিৎ ক্ষীর দ্বারা জলযোগ করা গেল।

জাহাজে একটী দৃশ্য দেখিলাম, একজন হিন্দুসমাজস্থ সাহসী যুবা আপনার স্ত্রীপুত্রদিগকে লইয়া প্রকাশ্যস্থানে মুর্গীর ঝোল ভাত খাইতে লাগিলেন, তাঁহার বিধবা শাশুড়ী একটী রুগ্ন নাতিকে নিজ হস্তে উহা খাওয়াইয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকের লোকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সময়ের কত পরিবর্ত্তন!

অপরাহ্নে যপ্‌সা গ্রামে শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন সরকারের গৃহে উপনীত হইলাম। সেখানে দুইদিন কীর্ত্তন, উপাসনা ও বক্তৃতা হইল। একদিন ভোজেশ্বর গ্রামে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইল। আমাদের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র একটী খোল ও এক জোড়া মন্দিরা মাত্র ছিল। তথা

হইতে কোমড়পুর যাই। সেখানে রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র দাসের বাড়ীতে উপাসনা হয়। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী দেবী অন্তরালে থাকিয়া উপাসনায় যোগদান ও আমাদিগকে সাদরে আতিথ্য সৎকার করিয়াছিলেন।

সেইদিন অপরাহ্নে আমরা সন্দ্বীপ পৌঁছি। সন্দ্বীপে মুন্সেফী কাছারী প্রভৃতি আছে। পোষ্ট আফিসে যাইয়া সন্ধান করা গেল সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মে সহানুভূতিকারী কেহ আছেন কি না, স্কুল কি অন্য কোথাও বক্তৃতা কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করা যায় কি না। উত্তর হইল নিরাশজনক। সেখানে কিছু হইতে পারিবে না ইহাই লোকে বলিল। প্রভু বলিলেন "আমার নাম লইয়া বাহির হও"। আমরা এক অপরিচিত মুদি দোকানে বস্ত্রাদি রাখিয়া পতাকাহস্তে খোল ও মন্দিরা সহ প্রভুর নাম করিতে বাহির হইলাম। নাম করিতে করিতে যেখানে লোক জমে সেখানে কোথাও উপদেশ, কোথাও প্রার্থনা হইল। সায়ংকালে তত্রত্য উকীল বাবু রজনীকান্ত ঘটক আমাদিগকে দ্বারে বৃষ্টিতে ভিজিয়া কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া স্বীয় বৈঠকখানায় বসিতে অনুরোধ করিলেন। সেখানে অনেক লোক জুটিয়া গেল, রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত উপাসনা, উপদেশ, কীর্ত্তন ও প্রসঙ্গ হইল। তৎপর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে আমরা মুদি দোকানে আসিয়া ভাতে ভাত রান্না করিতেছি, এমন সময় এত রাত্রিতে একজন ভদ্রলোক এক বাটী দুধ লইয়া আসিয়া উপস্থিত। দেখিয়া আমরা অবাক্। দাসদের প্রতি প্রভুর ভারি মমতা, শুধুভাত খাইতে দিলেন না। আমাদের সঙ্গে কোন বিছানাপত্র ছিল না, রাত্রিতে মুদিঘরে মাটীতে চাটাই পাতিয়া শুইব, সেই লোকটী ইহা শুনিয়া জেদ করিয়া আমাদিগকে এক ভদ্রলোকের বাড়ী লইয়া গেলেন। তিনি সেই বাড়ী থাকিতেন, স্বীয় বিছানা আমাদিগকে দিয়া তিনি অন্যের সঙ্গে শয়ন করিলেন। এমনই প্রভুর প্রেমের ব্যবস্থা!

পরদিন ৬।৭ মাইল দূরবর্ত্তী পালঙ্গ নামক স্থানে পদব্রজে গমন করি। খোল ও সঙ্গের সামান্য কিছু বস্ত্রাদি বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একজন কুলীর প্রয়োজন। ব্রাহ্মদের মোট বহন করিলে কুলীর জাতি নষ্ট হইবে ভয়ে কেহ আমাদের মোট বহন করিতে প্রস্তুত নহে। সেখানকার ভদ্রলোকেরা অনেক যত্ন করিয়া, এজন্য জাতি গেলে তাঁহারা দায়ী হইবেন এই কথা বলিয়া একটী লোক দিলেন। পালঙ্গ পৌঁছিয়া আমরা সত্বর বরিশালের জন্য একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম। নৌকায় বস্ত্রাদি রাখিয়া বাজারে কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলাম। বাজারে অনেক লোক আগ্রহের সহিত কীর্ত্তন ও উপদেশ শ্রবণ করিল। আরো হরিকথা শুনিবার জন্য নৌকার নিকট নদীতীরে অনেক লোক আসিয়া জুটিল। আমরা দুভাই নৌকার ছাদে বসিয়া, শ্রোতৃবৃন্দ নদীর পারে বসিয়া। অনেকক্ষণ তাঁদের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইল; তাঁহারা আর বিদায় দিতে চাহেন না। অত্যন্ত অনিচ্ছার মধ্যে সেখান হইতে বিদায় হইলাম।

তিনদিন নৌকায় উপাসনা প্রার্থনা প্রসঙ্গে কাটিয়া গেল। স্বহস্তে রান্না করিয়া আহার করা যাইত। বরিশালের বিধানবিরুদ্ধভাব স্মরণ হইয়া বিশেষ ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা হইত। ভগবানের চরণে উভয়ে মিলিয়া আত্মসমর্পণ করিলাম, দিনের অনেক সময় উপাসনায় কাটিয়া যাইত।

১৯শে বৈশাখ অপরাহ্ন পাঁচটার সময় আমরা বরিশাল পৌঁছি। পবিত্রাত্মা ভিন্ন আর কেহ আমাদের পথপ্রদর্শক নেতা ছিল না, আর কোন সম্বলও ছিল না। পবিত্রাত্মাঙ্কিত পতাকা হস্তে গৈরিক গায়ে খোল ও মন্দিরা হাতে দিয়া তিনি আমাদিগকে নগরের দ্বারে দ্বারে লইয়া চলিলেন। স্থানে স্থানে কীর্ত্তন, প্রার্থনা ও সংক্ষেপ উপদেশ হইল। অনেকে পবিত্রাত্মার অবতরণের আভাস পাইয়া আকৃষ্ট

হইলেন। পবিত্রাত্মার প্রকাশের গুণে দাসদের চেহারাও কিঞ্চিৎ বদলাইয়া গিয়াছিল, সেই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া লোক সকল উৎসুক অন্তঃকরণে পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিত।

অবশেষে সায়ংকালে একটী অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ী আনিয়া প্রভু এক আশ্চর্য্য লীলা প্রদর্শন করিলেন। আমরা তাঁহাকে চিনি না, তিনিও আমাদিগকে চিনেন না। তাঁহার দ্বারে নামগান হইতেছিল, তিনি আমাদিগকে ঘর্ম্মাক্ত দেখিয়া নিজ হস্তে পাখা-ব্যজন করিতেছিলেন। গান শেষ হইলে আদর করিয়া গৃহে গ্রহণ করিলেন। দুইচারি কথা আলাপের পরই আমাদিগকে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের জন্য বিলক্ষণ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমরাও আহ্লাদের সহিত তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। ইনি বরিশালের বিখ্যাত দেশনায়ক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, অল্পদিন ওকালতী করিতেছেন, একজন ক্ষমতাশালী উকীল হইবেন বলিয়া সকলের প্রত্যাশা। তখন ব্রজমোহন স্কুল কলেজাদি হয় নাই। তিনি আমাদের সঙ্গে খুব মাতিয়া গেলেন। প্রতিদিন নানা স্থান হইতে, অধিকাংশই হিন্দু বাড়ী হইতে কীর্ত্তন ও উপাসনার নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। সচরাচর কীর্ত্তন, সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও উপদেশ এবং তৎপর প্রসঙ্গ হইত। বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত নামে একজন প্রাচীন উকীল খুব আগ্রহের সহিত যোগ দিতে লাগিলেন, তদবধি তাঁহার জীবনের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। প্রায় মাসাধিককাল সেখানে প্রমত্ত উৎসাহ সহকারে পবিত্রাত্মার প্রেরণায় উপাসনা, উপদেশ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, প্রসঙ্গাদি হইল। কাশীপুর, নলছিটী, ঝালকাটী, পিরোজপুর, উজীরপুর, বাটাজোড়, মাদারীপুর, ভাঙ্গা, ফরিদপুর, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানে প্রচার হইল। প্রায় দেড়মাসকাল একটা প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। বাহুল্য ভয়ে আর লিখিলাম না।

এই যাত্রায় গোয়ালন্দে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, কয়েক বৎসর পর তাহা উঠিয়া যায়। পরম প্রভু তাঁহার ক্ষুদ্র দীন দাসদ্বয়কে নানা স্থানে স্বীয় কার্য্যে ব্যবহার করিয়া পুনরায় গৃহে লইয়া আসিলেন। ঢাকার বিশ্বাসী মণ্ডলী অতি সমাদরের সহিত আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন; পবিত্রাত্মা গৌরবান্বিত হইলেন। আমরা কাহারো নিকট ভিক্ষা চাই নাই; কিন্তু লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নৌকা ভাড়া ইত্যাদি পাথেয় দান করিয়াছেন।

এই বৎসর ২৫শে পৌষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। আমরা এক সপ্তাহ কাল শোকচিহ্ন ধারণ ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ করি, তৎপর কলিকাতায় যাইয়া পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করি। মাঘোৎসবের পর পরম ভক্তের দৈহিক চিহ্নস্বরূপ তাঁহার কিঞ্চিৎ দেহভস্ম ভক্তিহীন পূর্ব্ববাঙ্গলার উষর ক্ষেত্রে সমাহিত করিবার জন্য আনয়ন করা হয়। উহা এক্ষণ স্বর্গগত গোপীকৃষ্ণ সেনের ঢাকা উয়ারীস্থ বাড়ীর উদ্যানে স্থাপিত। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রমোহন সেন পিতার অভিপ্রায়ানুসারে ভস্মের উপর একটী সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরের সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

ঢাকাতে আমাদের সামাজিক উপাসনার মন্দির ছিল না। উপাসকগণ ক্রমে মন্দিরের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। মন্দিরের জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে যাইয়া, যেখানে এক্ষণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত, ঐ স্থানের প্রতিই প্রথমতঃ আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উহা তখন প্রাচীরবেষ্টিত পতিত জমি ছিল। একজন বৃদ্ধা আর্ম্মানী মহিলা উহার সত্বাধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ ভূমিখণ্ড মন্দিরের জন্য বন্দোবস্ত লইতে প্রস্তাব করি। তিনি সে কথা শুনিয়া রুষ্ট হইলেন এবং আমাকে দু'কথা শুনাইয়া তাড়াইয়া দিলেন। বিধাতার আশ্চর্য্য লীলা।

ইহার কয়েকমাস পর মহিলাটীর মৃত্যু হইল, তাঁহার সম্পত্তি রিসিভারের (receiver) হাতে গেল, নিলাম হইল, সেই নিলাম গোপীবাবু খরিদ করিলেন, এবং মন্দিরের জন্য সেই অংশটুকু ক্রয় করা হইল। বিধাতা কেমন করিয়া ঐ স্থানটীর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং কি সকল ঘটনাচক্র ঘটাইয়া উহা স্বীয় উপাসনা মন্দিরের জন্য গ্রহণ করিলেন দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। তিনি সকল অসম্ভবই সম্ভব করিতে পারেন। ১৮৮৫ খ্রী

১৮০৬ ও ১৮০৭শক দুই বৎসর মন্দির নির্ম্মাণ ও অর্থ সংগ্রহ কার্য্যে বিব্রত ছিলাম। ভাই ঈশানচন্দ্রের হস্তে মন্দির নির্ম্মাণের ভার ছিল, আমি তাঁহার সহকারিতা করিতাম। সমাজের যদিও আমি সহকারী সম্পাদক ছিলাম, কিন্তু কার্য্য সমস্তই আমাকে করিতে হইত। সম্পাদক দুর্গাদাস রায় মহাশয় দ্বারা কেবল দস্তখত মাত্র করান হইত। মন্দিরের জন্য অর্থসংগ্রহ উপলক্ষে নানা স্থানে প্রচারও হইত। ভিক্ষার ঝুলী লইয়া এক পয়সা ও কপর্দ্দক দান ও গ্রহণ করিয়াছি। প্রায় পাঁচ সহস্র টাকা মন্দিরের জন্য ব্যয় হয়, উহা সংগ্রহে গরিব মণ্ডলীর বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। মণ্ডলীর সকলেই অর্থসংগ্রহে পরিশ্রম করিয়াছেন। ভ্রাতৃবর রামপ্রসাদ সেন আমাকে লইয়া ঢাকার দোকান সমূহে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কত স্থানে শ্রদ্ধার সহিত লোকে ভিক্ষা দিয়া কৃতার্থ মনে করিত।

"ইষ্ট" পত্রের তাৎকালিক সম্পাদক বাবু শশীভূষণ রায়ের পত্রিকা লিখিয়া যশস্বী হইবার বাসনা আমি লক্ষ্য করিতাম। তিনি ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ের ঠিকাদার মিচেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে "ইষ্টে" প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত কোম্পানী মানহানীর মোকদ্দমা আনয়ন করে। শশীবাবু প্রায় ছয় মাস কাল মোকদ্দমায় বিব্রত থাকেন ও দণ্ডিত হন। সেই সময় আমাকে "ইষ্ট" সম্পাদন করিতে হইত। আমার ইংরেজী

বিদ্যা অতি সামান্য, কেমন করিয়া যে "ইষ্ট" সপ্তাহে সপ্তাহে বাহির করিতাম, এখন ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই।

বিধানপল্লী।

ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা ও আরমানীটোলায় বিধানপল্লী স্থাপিত হইল। অনেক ভগবল্লীলা হইল। এখানে চূড়ান্ত জমাট হইল। উৎসব, উপাসনা, অনুষ্ঠান অনেক হইল। তিন বৎসরে বোধ হয় সাতটী বিবাহ হইল। বিবাহগুলিও উৎসবের আকার ধারণ করিত। বন্ধুরা জানিতেন কম খরচে আমি কার্য্য উদ্ধার করিতে পারি। তাই কিশোরগঞ্জের বাবু জগমোহন বীরের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনীর সঙ্গে চট্টগ্রামের শ্রীমান মহিমচন্দ্র দাসের বিবাহের ভার আমার উপর অর্পিত হইল। আমার মনে হয় কন্যাপক্ষে ৬০৲ টাকায় বিবাহ ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। প্রায় শতাধিক লোকের গরিবের মত ভোজ, বরকন্যার বস্ত্রালঙ্কার, রেজেষ্টারী খরচ, শুভ-কর্ম্মের দান সকলই করা হইয়াছিল। অলঙ্কার মাত্র শাঁখা। এখন আর গরিব ভাবে বিবাহ চলে না। গরিবদের বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর্মানীটোলার বিধান-পল্লীতে আমার বিবাহ হয়। পশ্চাতে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখদা।

বালবিধবা।

হিন্দুসমাজে বাল-বিধবার জীবন অতিশয় বিষাদময় ও বিপৎসঙ্কুল। একদিকে শোক দুঃখের নিদারুণ যন্ত্রনা, অন্যদিকে সমাজে অনাদর অবহেলা, সর্ব্বোপরি নানারূপ প্রলোভন ও অত্যাচার। মানুষ সংসারসুখে বঞ্চিত হইয়াও যে যে উপায়ে সাধু জীবন যাপন করিতে পারে, হিন্দু বিধবার সে সকল বিষয়ে রীতিমত শিক্ষা ও সুবিধা নাই, পক্ষান্তরে পরিবারের অবহেলা, যৌবনের বিভীষিকা এবং অশাসিত পুরুষদিগের অত্যাচারে তাহাকে সর্ব্বদাই অস্থির থাকিতে হয়, তাহার জীবন বিষম ভারবহ হইয়া পড়ে। নারীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্মবলে অনেকে এই সকল বিষম বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দুঃখময় জীবন কোনরূপে অতিবাহিত করিয়া যান, কেহ কেহ বা দুর্ব্বল প্রকৃতিবশতঃ প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসিয়া ঘোরতর দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকেন। বিষম প্রলোভন ও বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও এক একটী অবলা বালবিধবা বিধাতার কৃপায় কেমন আশ্চর্য্যরূপে আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং পরিশেষে ব্রাহ্মসমাজের অভয় ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া কিরূপ নির্ম্মল জীবন লাভ করিয়া গিয়াছেন, সুখদার জীবন তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বাঙ্গলায় বরিশাল একটী প্রসিদ্ধ জেলা, এই জেলায় পোনাবালিয়া নামক গণ্ডগ্রামে অনুমান ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সুখদা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরনাথ রায় চৌধুরী, মাতার নাম বামাসুন্দরী

চৌধুরানী। এক সময়ে তাঁহাদের জমিদারী ছিল, সংসারের বিলক্ষণ উন্নতি ছিল। কালচক্রে জমিদারী নিলাম হইয়া যায়, সাংসারিক অবস্থা অতিশয় হীন হইয়া পড়ে। এই জমিদারীই ঢাকার নবাব পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ মাননীয় আলী মিঞা প্রকাশ্য নিলামে ক্রয় করেন। সুখদার পিতা জাতিতে বৈদ্য, তিনি এখন চিকিৎসা ব্যবসা দ্বারা অতিকষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি শান্ত প্রকৃতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। যশোহর জেলার বৈদ্য-প্রধান কালিয়া গ্রামের স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় সুখদার মাতামহ ছিলেন। সুখদার মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী, কর্ম্মশীলা ও তেজস্বিনী ছিলেন। তাঁহাদের পুত্রসন্তানগুলি অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তিনটী কন্যা মাত্র জীবিত ছিল। কন্যাদের মধ্যে সুখদা মধ্যমা।

হিন্দুসমাজের পুরাতন রীতি অনুসারে সপ্তমবর্ষ বয়সে সুখদার বিবাহ হয়। বিবাহের এক বৎসর পরেই তিনি বিধবা হইলেন। বাল্যবিবাহের বিষময় ফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। পিতা মাতা বড় আহ্লাদ সহকারে শিশু বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন, অচিরেই সেই আনন্দ ঘোরতর বিষাদে পরিণত হইল। বালিকা তখনও বুঝিতে পারিল না যে তাহার কি সর্ব্বনাশ হইল, কিন্তু পিতা মাতার মনে আর শান্তি রহিল না। মাতা প্রাণাধিকা কন্যার সঙ্গে নিরামিষ আহার করিতে লাগিলেন। সুখদা প্রথমে দিনে দুবার আহার এবং অঙ্গে আভরণাদি ধারণ করিতেন—পিতা মাতা কোন্ প্রাণে এই শিশুর প্রতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের বিধান করিবেন? যাহা হউক বয়োবৃদ্ধি সহকারে ব্রহ্মচারিণী বিধবার সম্যক্ বিধি তিনি পালন করিতে লাগিলেন। গাত্রাভরণ সকল অপসারিত হইল, দিনে একাহার, একাদশী-ব্রতপালন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

উপবাসাদি ব্রত পালনে মাতারই বিশেষ শাসন ছিল। প্রথম অবস্থায় উপবাসে একান্ত কাতর হইয়া সুখদা পিতার নিকট খাইতে চাহিতেন, স্নেহশীল পিতা প্রিয়তমা কন্যার ক্লেশ সহিতে না পারিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে আহার দিতেন। তজ্জন্য তাঁহাকে পত্নীর গঞ্জনা সহিতে হইত। বিধবা কন্যার বৈকালিক জলযোগের জন্য পিতা স্বয়ং নানাবিধ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। একদা শিবরাত্রির উপবাসে সুখদা বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। মাতা ক্রমাগত শিব-পূজা করিতেছেন। কন্যা শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, ক্ষুৎ-পিপাসায় তাহার প্রাণ অস্থির। তৃতীয় প্রহর রজনীতে পিতা আর কন্যার ক্লেশ সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি তাহাকে খাইতে দিলেন। মাতা ইহা বুঝিতে পারিয়া আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন, "এইত আর অল্পক্ষণ পরেই রাত্রি প্রভাত হইবে, অল্পের জন্য ব্রতভঙ্গ করা হইল।"

বিধবা হওয়ার পর সুখদা প্রায় সর্ব্বদাই মাতার সঙ্গে বাস করিতেন। বাসণ্ডা গ্রামবাসী পটুয়াখালীর প্রসিদ্ধ উকিল্ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁহার ছোট মাসী মুক্তকেশী দেবীর বিবাহ হয়। তাঁহার সন্তান ছিল না, তিনি কখন কখন সুখদাকে তাঁহার নিকট নিয়া রাখিতেন। কালিয়া গ্রামে মাতুলালয়েও কখন কখন অল্প দিনের জন্য বাস করিতেন। সুখদার খুল্লতাত ৺গোপীনাথ রায় চতুর্ধুরীণ একজন ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁহারই যত্নে সুখদা লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। অল্প বয়সেই সেই খুড়ার মৃত্যু হয়, সুতরাং সুখদা বেশী কিছু শিখিতে পারেন নাই। খুড়ার নিকটই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে একথাও তাঁহারই নিকট জানিতে পারেন।

বালবিধবার জীবনের সকলই দুঃখময়। বালিকার দেহে নব-

যৌবনের সঞ্চার দেখিয়া আত্মীয়জনের মনে কত আনন্দ জন্মে, কিন্তু দুঃখিনী বিধবার পক্ষে তাহা অতিশয় শোকোদ্দীপক ও ভীতিজনক। সুখদা যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার শরীরের রূপলাবণ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে পিতামাতা নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, তাঁহারা অতিশয় সাবধানে কন্যার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু সাবধান হইলে কি হইবে, এই হতভাগ্য দেশে, এই অধঃপতিত সমাজে আপনার আত্মীয়জনের নিকটেও যুবতী বিধবার জীবন নিরাপদ নহে। সতীর চিরসহায় বিধাতাই সেই অবলা রমণীর এক মাত্র রক্ষক। সুখদার জীবন তাঁহারই অপূর্ব্ব কৌশলে ঘোরতর পরীক্ষা ও প্রলোভনের হস্ত হইতে কেমন আশ্চর্য্য রূপে রক্ষা পাইয়াছিল, পরবর্ত্তী ঘটনায় তাহাই প্রকাশ পাইবে।

ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণ।

সুখদার মামা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় ময়মনসিংহ নগরে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বাস করিতেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী ও সমাজসংস্কারে উৎসাহী। সুখদা তাঁহার এই মামার নিকট চিঠিপত্র লিখিয়া আপনার দুঃখকষ্টের কথা জ্ঞাপন করিতেন। উমেশবাবু সুখদার বৈধব্যজীবনের ক্লেশ ও বিধবার জীবন যৌবন যে নিরাপদ নহে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেন। সুখদাকে তাঁহার নিকট আনিয়া কোনও সৎপাত্রের সহিত বিবাহ দিতে তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। তাঁহাকে ময়মনসিংহে আনিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে সুখদাকে পত্র লিখিতেন এবং তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্যও করিতেন।

এমন সময় সুখদার পিতা ব্রহ্মপুত্রে অষ্টমীস্নান করিবার জন্য সপরিবারে ময়মনসিংহে আসিতে ইচ্ছা করিয়া উমেশবাবুকে পত্র

লিখিলেন। উমেশবাবু সুখদাকে আনিবার ইহাই উত্তম সুযোগ মনে করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের পাথেয় পাঠাইয়া দিলেন এবং সুখদাকে যেন অবশ্য সঙ্গে আনা হয় এই বলিয়া ভগিনী ও ভগিনীপতিকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে ১২৯২ সালের চৈত্রমাসে তাঁহারা নৌকাপথে ময়মনসিংহ আগমন করেন। অষ্টমীস্নানের পরও ৩।৪ মাস কাল তাঁহারা উমেশবাবুর গৃহে অবস্থিতি করেন।

এই সময়ে মামা ও মামীর সঙ্গে সুখদার ধর্ম্মাদি বিষয়ে অনেক আলাপ হয়, ক্রমে বিবাহ বিষয়েও তাঁহার মতাদি গ্রহণ করা হয়। একবার বিহারীলাল দাস নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে সুখদার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, উমেশবাবু তাহা শুনিতে পান, এবং সজাতীয় বলিয়া তাহার সঙ্গে বিবাহ দিতেই উমেশবাবুর ইচ্ছা হয়। কিন্তু বিহারীকে আনাইয়া সব স্থির করিতে সময়ের প্রয়োজন, এদিকে সুখদাকে লইয়া তাঁহার পিতামাতা দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইলেন, তাঁহারা আর গৌণ করিতে সম্মত হইলেন না সুতরাং উমেশবাবু সুখদাকে ময়মনসিংহে রাখিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মদিগের আশ্রয়ে রাখা ভিন্ন অন্য উপায় নাই দেখিয়া তিনি সেই পন্থাই অবলম্বন করিলেন। ১২৯৩ সালের আষাঢ় মাসে উমেশবাবু সুখদাকে ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয়ে রাখিলেন। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের গৃহে সুখদা আশ্রয় লাভ করিলেন। সে বিবরণ শ্রীনাথবাবুর নিজের লেখায় নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"১২৯৩ সালের আষাঢ় মাসে একদিন উমেশবাবু আমার নিকট আসিয়া তাঁহার একটী আত্মীয়া বালবিধবার দুঃখের কথা বলিলেন। এই বালিকাটী তাঁহার সহোদরা ভগিনীর কন্যা, এখন তাঁহার গৃহেই আছেন। কন্যার পুনঃ বিবাহে ইচ্ছা আছে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আমি সকল কথা শুনিয়া এবং বন্ধুদিগের

অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া এই কন্যাটীকে আমার গৃহে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলাম। ইঁহাকে আশ্রয় দিলে যে অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইবে, হিন্দু সমাজ হইতে কঠোর পীড়ন হইবে তাহা আমি জানিতাম, তথাপি অস্বীকার করিতে পারিলাম না। উমেশবাবু তৎপরদিন রাত্রিতে তাঁহার ভাগিনেয়ীকে স্বয়ং আনিয়া আমার গৃহে রাখিয়া গেলেন। সেইদিন হইতেই সুখদা আমার পরিবারের কন্যাদের মধ্যে গণ্য হইলেন, আমিও তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় দেখিতে লাগিলাম।

"পরদিন সহরে এই ঘটনা লইয়া নানা কথা উঠিতে লাগিল। আমার প্রতিবেশী একজন সম্ভ্রান্ত উকীল আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন। দিন কাটিয়া গেল। রাত্রিতে দেখিলাম, আমার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে কয়েকটী লোক দূরে দূরে থাকিয়া পাহারা দিতেছে। তন্মধ্যে উক্ত উকীলবন্ধুর মুসলমান চাকরদিগকেও দেখিলাম। আমার আশঙ্কা হইল, সুখদাকে হয়ত বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে। তখন আর অন্য লোকের সাহায্য লইবার সময় ছিল না। আমার আত্মীয় দুই তিনটী যুবকসহ সাহসে নির্ভর করিয়া রহিলাম। আমার স্ত্রী সন্তানগণের সহিত যে গৃহে থাকেন সুখদা সেই ঘরে রহিলেন, আমি যুবকদিগকে লইয়া অন্য ঘরে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম। সুপারি গাছের বড় বড় ফালার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ করিয়া বল্লমের মত করিয়া লইলাম, তাহাই আমাদের সেই সংগ্রামের অস্ত্র হইল। তখন মনে কি দুর্জ্জয় সাহসই জন্মিয়াছিল! মনে হইল শত লোক আসিলেও আমাদের দুই চারি জনের মাথা থাকিতে তাহারা সুখদাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। যাহা হউক, রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিল। পরে শুনিলাম, আমরা পাছে সুখদাকে অন্যত্র প্রেরণ করি, এই আশঙ্কায় পাহারা রাখা হইয়াছিল।

"পর দিন প্রাতে ২।৪ জন করিয়া হিন্দুসমাজের ভদ্রলোক আমার রাড়ীতে আসিতে লাগিলেন, ক্রমে বহুলোক আসিলেন। তন্মধ্যে বাবু কালীশঙ্কর গুহ, অনাথবন্ধু গুহ, পরমানন্দ সেন, ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ঘোষ সাহেব এবং সুখদার পিতা প্রভৃতি ছিলেন। নানা কথা, তর্ক বিতর্ক, শাসন বাক্য, অনুরোধ উপরোধ চলিতে লাগিল। শেষে এই কথা উঠিল যে কন্যার অনিচ্ছা সত্বে আমি তাঁকে গৃহে রাখিয়াছি সুতরাং ইহা ধর্ম্মতঃ ও আইনতঃ অন্যায়। আমি বলিলাম, কন্যার একান্ত ইচ্ছাতেই আমি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছি। তিনি যতদিন ইচ্ছা করিবেন, এই গৃহে থাকিতে পারিবেন, তাঁহার অনিচ্ছায় তাঁহাকে এখান হইতে লইয়া যায় এরূপ শক্তি কাহারও নাই। আমার এইরূপ স্পষ্ট কথায় কেহ কেহ রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন, এবং আমি কেমন করিয়া সুখদাকে রাখি, তাহা শীঘ্রই দেখাইবেন বলিয়া শাসাইতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ কালীশঙ্কর বাবু প্রভৃতি সুবিবেচক ভদ্রগণ আমাকে বলিলেন, দেখুন, আমরা ত সকলই বুঝিতেছি, তথাপি কন্যার পিতার খাতিরে আপনাকে এই অনুরোধ করি, কন্যার মুখে আমরা শুনিয়া যাইতে চাই যে, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে এখানে আসিয়াছেন। আমি সন্তুষ্টমনে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কালীশঙ্কর বাবুকে বলিলাম, আপনি স্বয়ং কন্যার পিতাকে লইয়া আমার অন্দর গৃহে গমন করুন, সে ঘরে আর কেহই থাকিবে না, আপনারা যত সময় ইচ্ছা তথায় থাকিয়া কন্যার মত অবগত হউন, তিনি যদি পিতার সহিত যাইতে চাহেন, এই মুহূর্ত্তে লইয়া যাইতে পারিবেন। সকলে সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কালীশঙ্কর বাবু আমাকে সেই স্থলে উপস্থিত থাকিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি তথায় গেলাম না।

"কালীশঙ্কর বাবু ও কন্যার পিতা অনেকক্ষণ সুখদার নিকট রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কি কি কথা হইয়াছিল জানি না। অনেকক্ষণ

পরে কালীশঙ্কর বাবু আসিয়া সকলের সমক্ষে বলিলেন, কন্যা নিজের ইচ্ছায় শ্রীনাথবাবুর গৃহে আসিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজেই থাকিবেন, আর পিতার গৃহে যাইবেন না। তাঁর পিতা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক ভয় দেখাইলেন, এবং আমিও অনেক কথা বলিলাম, কন্যার সঙ্কল্প অটল রহিয়াছে, সুতরাং অতঃপর আর কোনও কথা বলিবার নাই। সুখদার পিতা মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। সকলে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

"আমরা একটু নিশ্চিন্ত হইলাম, ভাবিলাম এই পর্য্যন্তই শেষ, আর কোনও গোলযোগ হইবে না। দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে আমি স্কুলে গেলাম, সুখদার মাতা আমাদের বাড়ী আসিলেন, উমেশ বাবুকেও আমাদের বাড়ীতে ডাকিয়া আনিলেন, তিনি আর সে দিন কাছারীতে গেলেন না। ভাবিলাম ভাই বোনে কন্যা লইয়া পরামর্শাদি করিবেন। তিনটার সময় শুনিতে পাইলাম, সুখদার পিতা কন্যালাভের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন, তাঁর ১৩ বৎসরের * অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকে উমেশ বাবু বলপূর্ব্বক নিয়া শ্রীনাথ বাবুর গৃহে আটক রাখিয়াছেন, উহাকে মুক্ত করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। আমলাদের যোগাড়ে সাহেব হুকুম দিয়াছেন, পুলিশ ইন্স্পেক্টর এখনই কন্যাটিকে উদ্ধার করিয়া দুই শত টাকা জামিন লইয়া তাহার পিতার জিম্বায় রাখে, পরদিন মোকদ্দমা শুনা যাইবে। পুলিশ ইন্স্পেক্টর বাবু তৎক্ষণাৎ ৮ জন কনষ্টেবল সহ কন্যা উদ্ধারের জন্য বাহির হইলেন। এই সকল ঘটনা যেন উমেশ বাবু জানিতে না পারেন, এই জন্যই তাঁহার ভগিনী তাঁকে আমার বাড়ীতে নিয়া রাখেন ও কাছারীতে যাইতে দেন নাই। এদিকে গোপনে পরামর্শ হইল,

---

* প্রকৃতপক্ষে তখন সুখদার বয়স ২২ বৎসর।

তখনই মেয়ে উদ্ধার করিয়া পিতার হস্তে দেওয়া হইবে, পিতা একেবারে কন্যাসহ বরিশাল চলিয়া যাইবেন, জামিনের টাকা হিন্দু মহোদয়গণ চাঁদা করিয়া দিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হইল।

"অত্যধিক আনন্দে বিহ্বল হইয়া পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর পরোয়ানার সকল কথা পড়িলেন না, মেয়ে কোথায় আছে, সে কথা দেখিলেন না, উমেশ বাবু আসামী, সুতরাং কন্যাটী তাঁর গৃহেই আছে মনে করিয়া আটজন কনষ্টেবল সহ উমেশ বাবুর বাড়ী ঘেরিয়া বসিয়া রহিলেন, উমেশ বাবু কাছারী হইতে আসিলে কন্যাকে বাহির করিয়া লইবেন। এদিকে কন্যার পিতা পুলিশের অপেক্ষায় আমার বাড়ীর চারিদিকে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছেন। এমন সময় আমি খবর পাইলাম। তৎক্ষণাৎ গৃহে আসিলাম, তখন আর কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিবার সময় ছিল না, ভগবান বুদ্ধিতে যাহা যোগাইলেন, তাহাই করিলাম। কয়েকজন বন্ধুকে খবর দিলাম, তাড়াতাড়ি পাল্কী আনাইলাম, সুখদাকে সকল কথা সংক্ষেপে বলিয়া পাল্কীতে তুলিয়া লইলাম, পুলিশ আসিবার পূর্ব্বে একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যাইতে হইবে স্থির করিলাম।

"কয়েকটী উৎসাহী যুবক পিচের লাঠি হস্তে লইয়া আমার সঙ্গী হইলেন; উমেশ বাবু বাড়ীর দিকে যাইতেছিলেন, তাঁকে উকীলসহ কাছারীতে আসিতে বলিয়া পাঠাইলাম। আমরা যেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি, অমনি সুখদার পিতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "দোহাই মহারাণীর, আমার কন্যাকে বল করিয়া লইয়া যায়।" তাঁর মনে হইয়াছিল, আমরা সুখদাকে স্থানান্তরে লুকাইতেছি। আমি বলিলাম, ভয় নাই, আপনি যে সাহেবের নিকট কন্যার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, সুখদাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতেছি, আপনিও আসুন। তখন তিনি অবনত মস্তকে আমাদের অনুসরণ করিলেন।

তখন কাছারী প্রায় শেষ হইয়াছে, সাহেব এজলাস ছাড়িয়া প্রাইভেট্ রুমে গিয়াছেন। বারান্দায় পাল্কী রাখিয়া আমি উকীলের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় সুখদার পিতা আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, একবার সুখদাকে দেখিতে চাই, একটী কথা বলিব, দয়া করিয়া অনুমতি দিন। আমি বলিলাম, আপনি পাল্কীর মধ্যে যান, যাহা ইচ্ছা বলুন, কোন ভয় নাই। তিনি মেয়ের সহিত অনেকক্ষণ কথা বলিলেন। পরে সুখদার নিকট শুনিয়াছিলাম, তাঁর বাবা বলিয়াছিলেন, তুমি আমার নিকট থাকিতে চাহিও, নতুবা মিথ্যা মোকদ্দমা আনিয়াছি বলিয়া আমার জেল হইবে। সুখদা মহা সঙ্কটে পড়িয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন, কিন্তু সত্যের পথ ছাড়িলেন না। যাঁরা তাঁর জন্য এত করিতেছেন মিথ্যা বলিয়া তাঁহাদের বিপন্ন করিতে সম্মত হইলেন না। ইতিমধ্যে উকীল শ্রীযুক্ত হামিদউদ্দিন সাহেব আসিলেন, হিন্দু উকীল পাওয়া গেল না। উমেশ বাবু আসিলেন, আমাদের বন্ধুরাও অনেকে আসিলেন। আমাদের উকীল ও উমেশ বাবু সাহেবের প্রাইভেট্ রুমে যাইয়া সাহেবকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন, হিন্দুভ্রাতৃগণ অনেক প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন, সাহেব পূর্ব্বেই হুকুম দিয়াছেন, আজ আর কিছু হইবে না বলিয়া পেস্কার বাবু আমাদের বিদায় করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। সাহেব কন্যাকে স্বয়ং দেখিতে চাহিলেন। তখন সুখদাকে সাহেবের কোঠায় নেওয়া গেল। লজ্জায়, দুঃখে, ভয়ে, আশঙ্কায় সুখদার মুখ ম্লান হইয়াছিল, পা কাঁপিতেছিল, কিন্তু তার মধ্যেই একটা অটল সাহস ও নির্ভরের ভাব দেখিয়া আমাদের মনে বিস্ময় জন্মিল। যাহা হউক সাহেব অতিশয় সম্মানসহকারে সুখদাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজে তাঁর মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া আদেশ দিলেন, 'এ কন্যা প্রাপ্ত-বয়স্কা ও বিধবা,

সুতরাং ইহার ইচ্ছামতে আপন মাতুলের সম্মতি ক্রমে তাঁহাকে শ্রীনাথ বাবুর গৃহে বা অন্যত্র থাকিতে অনুমতি দেওয়া গেল।' আমাকে বলিলেন, আপনি ইঁহাকে গৃহে লইয়া যান, এবং আমি আশা করি ইঁহাকে সৎপাত্রে বিবাহ দিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে তৎপূর্ব্বে পুলিশের প্রতি যে আদেশ দিয়াছিলেন আমার প্রার্থনা ক্রমে তাহাও তৎক্ষণাৎ রহিত করিলেন।

"আমরা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া এবং সাহেবের করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সুখদাকে লইয়া গৃহে আসিলাম। সেই সময় কাছারী ঘরের চারিদিকে বহুলোক সমাগত হইয়াছিল, সেই জন-সমুদ্রের মধ্যে আমরা কয়েকটী ক্ষুদ্র প্রাণী। আমার দুই একটী হিন্দু বন্ধু কাণে কাণে বলিয়া দিলেন, কন্যাকে পথে সাবধানে নিও, বল প্রকাশের আয়োজন হইতেছে। তখন প্রাণে কি দুর্জ্জয় সাহসই না হইয়াছিল। কয়েকটী ব্রাহ্ম যুবক যষ্টি হস্তে পাল্কীর অগ্র পশ্চাৎ চলিলেন, আমি ও উমেশবাবু দুই দরজার নিকট রহিলাম। কিন্তু সকল ভয় কাটিয়া গেল, কেহ কিছু বলিতে সাহস পাইল না। এইরূপে একটী অসহায়া বালবিধবা ঘোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লাভ করিলেন।

"তখনও সুখদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। কোনও কথা জানা আবশ্যক হইলে আমার স্ত্রীই তাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে বলিতেন। সুখদা কাছারী হইতে গৃহে আসিয়া শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন শুনিয়া আমি তাঁর নিকটে গেলাম। তাঁকে দুই একটী সান্ত্বনা বাক্য বলিলাম, তিনি একটু ধৈর্য্য ধরিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দাদা, বাবা বলিয়াছেন, তাঁর জেল হইবে, আপনারা এ দুঃখিনীর জন্য অনেক করিলেন, এখন বাবাকে রক্ষা করুন।" আমি তাঁকে বুঝাইয়া দিলাম, মোকদ্দমা মিটিয়া গিয়াছে, তাঁহার

কিছুই হইবে না। তখন সেই পিতৃ-বৎসলা কন্যার মুখে যে সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতার ভাব দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। এই দিন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সুখদা আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন; সম্পদে বিপদে আমার উপর তাঁহার অটল আস্থা ও নির্ভর ছিল। তাঁহার পবিত্র কণ্ঠ নীরব হইয়াছে, কিন্তু সে মধুর ধ্বনি, সে অকারণ স্নেহ, আজ ও এ হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।"

পরীক্ষা।

মোকদ্দমা মিটিয়া গেল, কিন্তু সুখদার অগ্নিপরীক্ষা এখানেই শেষ হইল না। সুখদার পিতা-মাতা শ্রীনাথবাবুর প্রতিবেশী একজন সজাতীয় উকীলের বাসায় আশ্রয় লইলেন। তথা হইতে সুখদার মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ীতে পুত্রকন্যা মরিলে মেয়েরা যেমন চীৎকার করিয়া ও নানারূপ বিলাপজনক কথা বলিয়া ক্রন্দন করে, ঠিক তেমনি আরম্ভ করিলেন। সকলে কাছারী গেলে যখন বাড়ী শূন্য হয় তখন প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টা করিয়া এইরূপ ক্রন্দন, বিলাপ ও অভিশাপ চলিতে থাকে। বালিকার প্রাণে আর কত সহিবে, সুখদাও সঙ্গে সঙ্গে রোদন করেন এবং শয্যায় পড়িয়া থাকেন। ক্রমে যখন প্রতিবেশী সকলে মহাবিরক্ত হইয়া উঠিল, তখন সুখদার মাতা শ্রীনাথবাবুর বাড়ীতে আসিতে লাগিলেন এবং কন্যাকে কখন প্রবোধ দিয়া, কখন ভয় দেখাইয়া, কখনও বা মহা তিরস্কার করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইল, মাতার কঠোর তিরস্কার ও ক্রোধ প্রকাশে সুখদা বিচলিত হইবার মেয়ে ছিলেন না। সুখদার পিতা যখন কন্যালাভে নিরাশ হইলেন, তখন পত্নীসহ স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। হিন্দুসমাজে

অপমান ও নির্য্যাতন ভয়ে তাঁহারা আর স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই, অবশিষ্ট জীবন কলিকাতা কালীঘাটে যাপন করিয়াছেন।

আর এক সঙ্কট উপস্থিত হইল। সুখদা যখন উমেশবাবুর গৃহে ছিলেন, তখন বরিশাল জেলা নিবাসী বৈদ্যবংশজাত বিহারীলাল দাস নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে সুখদার বিবাহের প্রস্তাব হয়। উমেশবাবু বিহারীকে ময়মনসিংহে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বিহারী যথাসময়ে আইসে নাই। এখন সুখদা ব্রাহ্মসমাজে আসিলে বিহারী ময়মনসিংহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুখদার পিতা বিহারীকে জানিতেন, বিহারী স্বদেশে একজন প্রসিদ্ধ জালিয়াত ও বদলোক বলিয়া পরিচিত। তিনি চলিয়া যাইবার সময় উমেশবাবু ও শ্রীনাথবাবুকে বারম্বার অনুরোধ করিয়া গেলেন, যেন বিহারীর সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ না হয়। সুখদাও সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

ঢাকায় আগমন।

বিহারী ভগ্ন মনোরথ হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইল। সুখদার সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসার কথা চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল, যেন ভবিষ্যতে কোন সৎলোকের সঙ্গে তাঁহার পরিণয় না হইতে পারে।

এই সময়ে শ্রীনাথবাবুর পত্নী পীড়িতা ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য ১২৯৩ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীনাথবাবু সপরিবারে ঢাকায় আগমন করিলেন, সুখদাও তাঁহাদের সঙ্গে আসিলেন। তখন ঢাকা আর্মাণীটোলায় বিধানপল্লী স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেন, ডাক্তার দুর্গাদাস রায় ও ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়গণ তথায় বাড়ী করিয়াছিলেন। প্রচারকগণও কেহ কেহ তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিতে ছিলেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় মহাশয়ের গৃহে

শ্রীনাথবাবুর পরিবার সন্তানগণ ও সুখদাকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সুখদা ঢাকায় আসিয়া অনেকটা আরাম বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি পল্লীবাসিনীদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রাত্যহিক উপাসনায় উপস্থিত থাকিতেন, নানাবিধ সৎপ্রসঙ্গ ও সদালাপে সুখী হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই, একটু যে শান্তি সুখে থাকিবেন তখনও তাঁহার জীবনে সে শুভ সময় উপস্থিত হয় নাই, তাঁহার অগ্নিপরীক্ষার তখনও শেষ হয় নাই।

সুখদা ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছেন শুনিয়া বিহারী ঢাকাতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। ঢাকার দুইখানি ব্রাহ্মবিদ্বেষী বাঙ্গলা সংবাদপত্রে সুখদার সম্বন্ধে অনেক গ্লানিপূর্ণ পত্র প্রকাশ করিল।

পিতৃমাতৃ-ক্রোড়-চ্যুতা অনাথা বালবিধবার প্রতি ক্রমাগত এই সকল তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পল্লীর মেয়েদের কর্ণেও সংবাদ পত্রের এই সকল কথা প্রবেশ করিল, দুঃখিনী সুখদা সে সকল বুঝিতে পারিয়া মর্ম্মে মরিয়া গেলেন! লজ্জাভয়ে অভিভূত হইয়া মনে মনে কেবল সেই বিপদভঞ্জন কলঙ্কহারী ভগবানের নাম লইতে লাগিলেন। যিনি অগতির গতি, অসহায়ের সহায়, এই বিপন্না অবলার কাতর কণ্ঠ তাঁহার চরণে পৌঁছিল; যিনি যুগে যুগে সতীর মান রক্ষা করিয়াছেন, অবলাজনের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, তিনিই প্রসন্ন হইয়া এই চিরদুঃখিনী কন্যার লজ্জা নিবারণ করিলেন, তাঁহার নিরাশ্রয় জীবনের আশ্রয় দেখাইয়া দিলেন।

যখন সুখদার জীবনে এইরূপ ভীষণ পরীক্ষা চলিতেছিল, তখনই বিধাতার লীলায় তাঁহার রক্ষার ও সুগতি লাভের উপায় হইতেছিল।

সুখদার পরম হিতৈষী দাদা এবং পল্লীস্থ সহৃদয় ব্রাহ্মগণ তাঁহার জন্য সুপাত্রের অন্বেষণ করিতেছিলেন। বিধাতার কৃপায় অভাবনীয়রূপে তাহা মিলিয়াছিল। সে বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে। এই সময় শ্রীনাথবাবুর পত্নী কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করাতে কার্ত্তিক মাসে শ্রীনাথবাবু আসিয়া তাঁহার পরিবারসহ সুখদাকে ময়মনসিংহ লইয়া গেলেন।

বিবাহ।

সুখদার জীবনের কথা লিখিতে গেলে নিজ জীবনের কোন কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করিতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার ব্রত অবলম্বন করিয়া ঢাকাস্থ প্রচারক মণ্ডলীতে স্থান প্রাপ্ত হই। বিবাহযোগ্য বয়স হইলে বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু-কাল কোনও স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি নাই। বিবাহ করিয়া জীবনের ভার বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা ছিল না। অবিবাহিত জীবনই পছন্দ করিতাম। ১২৯৩ সালের ভাদ্র মাসে ঢাকা নববিধান সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইল। উৎসবে স্বেচ্ছা রুচি ত্যাগ, বাসনা বর্জ্জিত হইয়া আত্ম বলিদান ইত্যাদি বিষয়ে জ্বলন্ত প্রার্থনা ও উপদেশাদি হইল। তৎকালে এক দিন দেবালয়ে উপাসনায় স্বীয় জীবনে প্রভুর ইচ্ছা বুঝিতে প্রার্থী হইলাম, তখন "নারীপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া আমার প্রেমলাভ কর" এরূপ অনুজ্ঞা প্রকাশ পাইল। ধর্ম্মবন্ধুদিগকে উহা জ্ঞাপন করিলাম। তখন ৩।৪টী পাত্রীর সহিত বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত হইল। সুখদাও তন্মধ্যে অন্যতমা। বন্ধুদিগকে বলিলাম আপনারা ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করুন। ঢাকাস্থ "পবিত্রাত্মার দাসমণ্ডলী" সমবেত আলোক লাভ করিয়া সুখদার সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। আমিও

প্রভুর শরণাপন্ন হইলাম, এবং সুখদার সঙ্গে বিবাহে তাঁহার অনুজ্ঞা লাভ করিলাম। বন্ধুগণ তৎপূর্ব্বেই সুখদার অভিভাবক শ্রীনাথ বাবু ও উমেশ বাবুর অভিপ্রায় জানিয়াছিলেন।

আমি কঠিন সমস্যায় পতিত হইলাম, যে নারীর নানা রূপ কলঙ্কের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, এরূপ স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে হইবে, এই চিন্তায় মনে বিষম পরীক্ষা উপস্থিত হইল। মনের ভিতর এত দূর সংগ্রাম হইত যে কোন কোন দিন দিবা রাত্রি আর নিদ্রা হইত না। কেবল শান্তিদাতা প্রভুর মুখ পানে তাকাইয়া আরাম পাইতাম। কোনও দিন সে মুখও দেখিতে পাইতাম না, চারিদিক অন্ধকার বোধ হইত। সে ঘোর পরীক্ষার কথা এখানে সবিস্তার বলা নিষ্প্রয়োজন। বিবাহের পূর্ব্বে এইরূপ তীব্র তিক্তরস পান করাইয়া পুণ্যময় ভগবান এ দাসের নূতন জীবনের সূত্রপাত করিলেন।

শ্রীনাথবাবুর পরিবার সহ সুখদা পুনরায় ময়মনসিংহে গেলেন। কিছু দিন পরে শ্রীনাথবাবু আমাকে এই পত্র লিখিলেন।

ময়মনসিংহ,
১৩ই কার্ত্তিক।

"প্রিয় বৈকুণ্ঠ,

"এ বিবাহে যে বাহিরে পরীক্ষা অনেক হইবে তাহা তো জানাই আছে। সে জন্য আমার মন সর্ব্বদাই প্রস্তুত। মানুষের কথার— মানুষের নিন্দা প্রশংসার আর কোন মূল্য দেখিতেছি না। মার ইচ্ছা পালন করিতে গেলে পৃথিবীর নির্য্যাতন সহিতেই হইবে। মাকে জীবন্ত ভাবে যাহারা গ্রহণ করে, পৃথিবী তাহাদের কার্য্য সহ্য করিতে পারে না।

"লোকে কিরূপ কথা উঠাইয়াছে তাহা আর শুনিতে চাই না। মানুষ না বলিতে পারে—না করিতে পারে এরূপ কি আছে? মার কাছে খাঁটী থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছা বুঝিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। মার ইচ্ছা পালনই তোমাদের ব্রত, আমি আর কি বলিব?

"তোমরা কি একটু চিন্তিত হইয়াছ? তোমাদের কোনও পত্রে পরিষ্কার ভাব জানিতে না পারিয়া আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। দুর্গানাথ বাবু ও ঈশানবাবু পত্র লিখিয়া জানাইবেন বলিয়া ও কিছু লেখেন নাই।

"শ্রীমতী কয়েক দিন হইল তোমার বা ঢাকার আর কাহার ও পত্র না পাইয়া একটু বিষন্ন হইয়াছেন, বোধ হয়।

"বিবাহের প্রস্তাব নির্দ্ধারণ হওয়ার পর হইতে, আমি শ্রীমতীর যে একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি তাহা এইরূপ, (১) পূর্ব্বাপেক্ষা মনের প্রফুল্লতা, (২) উপাসনায় যথা সময়ে উপস্থিত হওয়া এবং কিঞ্চিৎ আগ্রহ, (৩) সংসারের কাজ কর্ম্ম একটু যত্ন ও মমতার সহিত করা, (৪) আমাদের প্রতি এবং ছেলেমেয়ের প্রতি আত্মীয় ভাব।

"তোমার প্রতি এবং তথাকার মণ্ডলীর প্রতি ইঁহার বিলক্ষণ মনের টান আছে, নানা ঘটনায় আমি তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি।

"এখানকার শরৎবাবু প্রভৃতি আমাদের আত্মীয়গণ কোন রূপ আপত্তি করিলে করিতে পারেন বলিয়া আমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে। শরৎবাবু এরূপ আগ্রহ এবং সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই।

"বিহারী দাস এখানে কয়েক দিন ছিল, তার ভাব এই বুঝা গেল, যাহাতে ভয় পাইয়া কেহ বিবাহ না করে, এই মেয়েটা ক্লেশ পায়,

সে তাহারই চেষ্টা করিবে। এরূপ প্রতিহিংসা আর দেখি নাই। জামালপুরের তারিণী মজুমদার সম্বন্ধে উমেশবাবু যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, বিহারী তাহা শুনিতে পাইয়া, তাঁর সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁহাকে নানা কুৎসিত কথা বলে ও ভয় দেখায়। আমার মতে এ বিষয়ে উপেক্ষা দেখাইয়া আমাদের কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়াই ভাল। তোমরা যাহা নির্দ্ধারণ কর সত্বর জানাইবে।

"ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্য্যন্ত শ্রীমতী এখানে থাকিবেন আমি ইহা অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং তাহা যথা সময়ে তোমাদিগকে জানাইয়াছি। গত কল্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়া গিয়াছে। আমাদের গৃহে কল্য বড় চমৎকার উপাসনা ও ভাইভগিনীর সম্মিলন হইয়াছিল। মাকে না জানিলে ভাইভগিনীকে চেনা যায় না, মাঝ খানে মাকে পাইলে পুত্রকন্যাদের যে পবিত্র আনন্দ ও স্বর্গ সুখ হয়, তাহার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা হইয়াছিল।

"ভক্তিভাজন রায় মহাশয়কে এবং মণ্ডলীস্থ সমস্ত ভাই ভগিনী-দিগকে আমাদের প্রণাম, নমস্কার, প্রীতি ও স্নেহ জানাইবে।

"বামার সহিত আলাপ করিয়া দেখিলাম, সুখদার সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব পূর্ব্বের মত নাই। এ বিবাহে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। তবে লোকের নিন্দা এক একবার ভাবেন, যাহার কিছুই মূল্য নাই।

"তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, সুখদাকে লইয়া এখানে যে মোকদ্দমা হয়, তাহার কয়েক দিন পর এখানকার কোন কোন শিক্ষিত লোক সেওরার রামসুন্দর সেনের সাহায্যে ১৫।২০ জন সর্দ্দার লইয়া আমার বাড়ী হইতে মেয়েকে বল করিয়া রাত্রিতে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, বিধাতার কৌশলে সব মিছা হইয়া যায়। এত দিনে সে সব কথা বাহির হইতেছে। এবারের পরীক্ষায় মানুষের বল ও ক্ষমতাকে একেবারেই অসার বলিয়া বুঝিলাম। সমুদয় সহরের গণ্য

মান্য লোকগুলিকে এরূপ অপদস্থ হইতে দেখিয়া, বিধাতার জীবন্ত ক্রিয়ার নিকট কাহার মস্তক না অবনত হয়?

*　　*　　*　　*

তোমার

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।”

আমি প্রথমতঃ সুখদাকে একখানি পত্র লিখি, তাহা পাইয়া তিনি এইরূপ উত্তর লিখেনঃ—

“শ্রীঈশ্বর ভরসা।　　ময়মনসিংহ

“শ্রদ্ধাস্পদেষু,

“দয়াময়ী মার কৃপায় আপনার চিঠিখানি পাইয়া যার পর নাই সন্তোষ হইলাম। *　*　* ঈশ্বরের প্রতি আমার কিরূপ বিশ্বাস জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে লিখি, ঈশ্বর সর্ব্বদা আমাদের নিকটে আছেন, *　*　* যদি সরল মনে ডাকা যায়, তাঁহাকে দেখা যায়। এই মা আমার নিকট আসিয়াছেন তাঁর শান্তি ক্রোড়ে লইতে তাহা ভাবিয়া আমাদের মনে শান্তি হয়, এইরূপ আমার বিশ্বাস। বিবাহ বলিতে যাহা বুঝি তাহা জানিয়াও লিখিতে পারিলাম না, পরে বলিব।

*　　*　　*　　*

আমি সুখের আশা কম করি, একটু শান্তি চাই। আমি যে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি, কেবল মার কৃপায়। মা বিনা আমার আর কে আছে? তুমি সম্বোধনে সুখী হইয়াছি। *　* আমি ভাল আছি। আমার লেখা ভাল না। ইতি—

শ্রীসুখদাসুন্দরী গুপ্তা।”

২য় পত্র। ময়মনসিংহ
"ঈশ্বর সহায়। কার্ত্তিক।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

"আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম, অশান্তি হইতে শান্তি পাইলাম কারণ পত্র উত্তর বড় বিলম্বে দিয়াছেন। এত বিলম্ব করিবেন না। পত্র না পাইয়া বড় দুঃখিত ছিলাম। আজ তাহা দূর হইল। আমি সরল মনে লিখি কোন বিষয় মনে রাখিনা; সত্য আমি আপনার সহধর্ম্মিণী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি এবং মারও এরূপ ইচ্ছা নতুবা কি হইতে পারে? তাঁর যাহা ইচ্ছা তাহা পূর্ণ হউক। আমার ইচ্ছার কারণ ধর্ম্মশিক্ষা জ্ঞানলাভ ও স্বর্গীয় সুখ। আর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানাথ রায় মহাশয় যে শীঘ্র যাইতে লিখিয়াছেন তাহাতে আপনার কি মত? আপনি যাহা লিখিবেন তাহাই করিব। আজ অধিক লিখিবার সময় নাই পরে লিখিব। দিনদিন যেন আপনার একখানি পত্র পাই এই আশা করি। আজ শরীর ভাল নয়। আপনার শরীর কেমন আছে তাহা লিখিবেন। ভগ্নীর হাত এক রকম আছে শ্রীমান শ্রীমতীরা ভাল আছে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বাবু ভাল আছেন। * * * আজ বিদায় চাই। ইতি

আপনার স্নেহের সুখদা।"

কিছুদিন পরে ভাই ঈশানচন্দ্র সেন ও দুর্গানাথ রায় ময়মনসিংহে যাইয়া সুখদাকে ঢাকায় আনয়ন করিলেন। শ্রীনাথবাবু সপরিবারে বিশেষভাবে উপাসনাদি করিয়া সুখদাকে শুভ-বিবাহের জন্য প্রেরণ করিলেন। সুখদা ঢাকায় আসিয়া শ্রীযুক্ত ভাই দুর্গানাথ রায়ের পরিবারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রথমদিন রায় মহাশয় প্রার্থনা করিয়া সুখদার সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত করিয়া দেন। তৎপর কিছুদিন প্রায় প্রত্যহ অপরাহ্নে একত্রে প্রার্থনা ও প্রসঙ্গ হইত। ভিন্ন

ভিন্ন আসনে যথোচিত স্থানের দূরত্ব রাখিয়া আমরা উপবিষ্ট হইতাম। গৃহে দ্বার খোলা থাকিত, যেন দূর হইতে সহজে আমাদিগকে অন্যে দেখিতে পারে। বিবাহের পূর্ব্বে প্রেমালাপ আমাদের দেশে নূতন, সুতরাং বিশেষ সাবধানতার সহিত উহা সমাজে প্রবিষ্ট করা প্রয়োজন। তজ্জন্য খুব সাবধানে থাকিতাম। আমাদের আলাপ সাধারণতঃ ধর্ম্ম, প্রকৃতবিবাহ, পূর্ব্বজীবনের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে হইত। সুখদা অতি অল্পই কথা বলিতেন, আমাকেই উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিতে হইত।

বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইবার প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে বিবাহের দিন ধার্য্য হয়। এসময় মধ্যে সুখদা সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন, আলোচনা, পরীক্ষা, অনুসন্ধানাদি করা হয়। দেড়াহুন ট্রেইনিং স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু কালীকান্ত সেন আমার একজন পরিচিত বন্ধু, তাঁহার নিবাস সুখদার পিত্রালয় পোনাবালিয়ার নিকটবর্ত্তী কুলকাটী গ্রামে। তাঁহার সঙ্গে সুখদার সম্পর্কও ছিল। কখন কখন মাতার সহিত সুখদা তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতেন। কালীকান্ত বাবুর নিকট সুখদার সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া এই উত্তর পাইয়াছিলাম :—

Dehra Dun,
5th. Novr, 86.

"My dear Baikunta Babu,

Your favor came to hand duly. I know the girl and have had no cause whatever to form an opinion against her at any time. On the contrary she always appeared to me to be of a respectable character. But under what circumstances she left home and took shelter in a Brahmo family at Dacca, is quite unknown to me. I shall be glad to see her joined to a good friend like

yourself and hope she is still the same that I found her to be when she came to see me with her mother last year and stayed with us one night at Koolakuttee, our native village in Buckergunje.

*   *   *   *   *

Yours Sincerely,
Sd. Kali Kanta Sen."

ইংরেজী পত্রে শেষ ভাগে কালীকান্ত বাবুর স্কুল ইত্যাদির কথা ছিল, তাহা ছাপান নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এই যে সুখদা তাঁহার পরিচিতা, তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছুই জানেন না, বরং তদ্বিপরীতে উৎকৃষ্ট চরিত্র বলিয়াই জানেন। তবে তিনি কি অবস্থায় ঢাকায় আসিয়াছেন তাহা কিছুই জানেন না। আমার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হইলে কালীকান্তবাবু সুখী হইবেন, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ বিহারী দাসই ভয়ানক প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া সুখদার সম্বন্ধে নানা রূপ কুৎসা রটনা করিতেছিল। তদ্ভিন্ন আর তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কাহারও মুখে কিছু শুনা যায় নাই। ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করার পরবর্ত্তী জীবনে বিহারীর উক্তির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং তাঁহার বিশুদ্ধ প্রকৃতির যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী বাঙ্গালা ১২৯৩ সালের ১৮ই পৌষ শনিবার ঢাকা আরমানীটোলা বিধানপল্লীতে আমাদের শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। এ সম্বন্ধে তৎকালে লিখিত স্মৃতিপুস্তক হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইল।

১লা জানুয়ারী ১৮৮৭—প্রাতঃকালের উপাসনায় মা আনন্দময়ী তাঁহার স্বর্গীয় পরিবারসহ বিশেষভাবে প্রকাশিত হন, তাঁহাদের

আশীর্ব্বাদ মস্তকে বর্ষণ করেন। এই পরিণয়ে পরম মাতার ইচ্ছা সম্পন্ন হওয়াতেই দীন কাঙ্গালের প্রতি ভক্তদলের এত অনুগ্রহ বর্ষিত হইল। মাতৃবক্ষে পরলোকগত যোগী ঋষি সাধু মহাজনগণ আছেন জানিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ঈশা, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি প্রেরিত মহাপুরুষদিগকে প্রণাম করি। পরলোকস্থ পূর্ব্বপুরুষদিগকে এবং ইহলোকস্থ মাতৃদেবীকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করি। নববিধানের পৃথিবীস্থ বর্ত্তমান বিশ্বাসী পরিবারকে নমস্কার করি। ঢাকাস্থ নব-বিধান পরিবারকে নমস্কার করি।

সকাল বেলা পল্লীর ব্রহ্মকন্যারা সমবেত হইয়া গায়ে হলুদ মাখাইয়া আমাকে স্নান করাইলেন। তখন এই মর্ম্মে প্রার্থনা করিলাম, "মা প্রেমময়ী, তুমি তোমার স্বর্গীয় দেবীদিগকে লইয়া অবতীর্ণ হইলে, এই সকল পবিত্র হস্তে তুমি আমায় স্পর্শ করিয়া আমার সমুদয় পাপ মলিনতা ধৌত করিলে। মা পুণ্যময়ী, তোমাকে ইঁহাদের ভিতরে অবতীর্ণ দেখিয়া সকলকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি।"

রজনীতে বিবাহসভায় যাইবার পূর্ব্বে পুরাঙ্গনারা সমবেত হইয়া আমাকে পুষ্প-চন্দনে সাজাইয়া দিলেন। তখন এই মর্ম্মে প্রার্থনা করিলাম—"মা, তুমি তোমার সতী কন্যাদিগকে লইয়া এখানে অবতীর্ণ হইয়াছ। ইঁহাদের স্নেহের কোমল হস্তে এই দেহকে সুসজ্জিত করিয়া দিলে। এখন আশীর্ব্বাদ কর, তোমার শুভ-অনুষ্ঠান তোমার ইচ্ছানুরূপ সম্পন্ন হউক।"

রাত্রি আট ঘটিকার সময় বিবাহ অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল, এবং সাড়ে নয়টাতে শেষ হইল। শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত ভাই ঈশানচন্দ্র সেন পুরোহিতের কার্য্য করেন এবং শ্রীনাথ চন্দ কন্যাকর্ত্তার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বাবু জগদ্বন্ধু লাহা রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করেন। নিগূঢ় প্রেম শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ

হয়। উপদেশের মর্ম্ম এই, পত্নী আত্মার নিকট অবনত মস্তকে প্রেম শিখিতে হইবে, স্ত্রীকে প্রেমের গুরুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। স্ত্রী স্বামীতে পবিত্রাত্মাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন ও অনন্ত জীবনের সম্বল করিয়া লইবেন।

বিবাহান্তে গৃহে প্রবেশ করিলে মহিলারা স্ত্রী আচার ইত্যাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। আহারান্তে রাত্রি বারটার সময় তাঁহারা আমাদিগকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া আমরা উভয়ে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিলাম। আমি ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি বসিলাম, সুখদা ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। স্বর্গীয় প্রেম লাভের জন্য প্রার্থনা হইল।

পরম প্রেমময়ীকে শ্রীমতীতে আবির্ভূতা দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম। পরস্পর পদধূলি গ্রহণ করিলাম। পুনরায় মহাদেবের যোগ, ঋষিভাবের জন্য প্রার্থনা হইল। উভয়ে পরস্পরের ভিতরে পবিত্র দেবতাকে উপলব্ধি করিয়া স্পর্শ করা হইল। তৎপর গৈরিক বস্ত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া শয়ন করিলাম। নিশাবসানে উভয়ে একত্র কর বদ্ধ হইয়া পরম মাতার চরণে প্রার্থনা করিলাম,—যেন চিরদিন একাত্মা হইয়া আমরা তোমার ইচ্ছা জীবনে সম্পন্ন হইতে দিতে পারি।

বিবাহ রজনীতে খেচরান্ন দ্বারা প্রীতিভোজ হইল। আমাদের একটী পয়সারও সংস্থান ছিল না, প্রভু স্বয়ং সমস্ত ভার বহন করিলেন, কোথা হইতে কি আনিলেন, সকলই মানববুদ্ধির অগোচর। অনুষ্ঠানের কার্য্য নির্ব্বাহে ভাই ঈশানচন্দ্র সেন ও শ্রীনাথ চন্দ বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিলেন। বিবাহ সভায় ঢাকাস্থ উভয় দলের ব্রাহ্মবন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন। সাংসারিক স্বজনগণ মধ্যে প্রিয়তমা ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী স্বামী ও সন্তানগণসহ এবং কনিষ্ঠ ভাই শ্রীমান যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। স্থানান্তর হইতে শ্রীযুক্ত ভাই দীননাথ

কর্ম্মকার, চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার, বিহারীকান্ত চন্দ, বঙ্কবিহারী দাস ও পূর্ণচন্দ্র দাস উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিধান মণ্ডলীর মুখপত্র "বঙ্গবন্ধু" হইতে বিবাহ বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তখন ভাই দুর্গানাথ রায় "বঙ্গ বন্ধু"র সম্পাদক ছিলেন।

"ভাই বৈকুণ্ঠনাথের শুভোদ্বাহ বিধান।

"পূর্ব্ব বাঙ্গালা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে ভাই বৈকুণ্ঠের শুভোদ্বাহ ব্যাপার মা আনন্দময়ীর একটি আশ্চর্য্য লীলা বিধান। অতএব আমরা ইহা বিশেষভাবে এখানে লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারি না। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই অত্রত্য দাস মণ্ডলীর ভিতরে সাধুতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি পবিত্রতা-প্রিয়তার নিমিত্ত এই দলে বিশেষরূপে চিহ্নিত। ইনি যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে না করিতেই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী হন। যখন ইনি একটি স্কুলের বালক, তখন "ধর্ম্মজীবন তো লাভ করিতেই হইবে, তবে আর কালবিলম্বে প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া কায়মনপ্রাণে ধর্ম্মব্রত পালনে কৃতসঙ্কল্প হন। অনন্তর ভগবানের হস্তে জীবনের ভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই প্রচার ব্রতে ব্রতী হন। অত্রত্য দাসমণ্ডলীরূপ ক্ষুদ্র গৃহে ইঁহার বিশ্বাস-প্রধান চরিত্র একটী অটল স্তম্ভ সদৃশ। ইঁহার সাধুতা-প্রিয়তা এই ক্ষুদ্র দলের একটী উজ্জ্বল রত্ন ভূষণ বলিতে হইবে। ইঁহার প্রতি আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি। প্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়া আমাদের মধ্যে এই ভ্রাতা প্রায় দ্বাদশ বর্ষ অবিবাহিত অবস্থায় জীবন যাপন করিলেন। কিন্তু কখনও আমরা ইঁহাকে বিবাহের নিমিত্ত সমুৎসুক দেখি নাই। বরং তদ্বিরুদ্ধ ভাবই নানারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিবাহের আবশ্যকতা বিষয়ে পবিত্রাত্মা ভগবানের ইঙ্গিত পাইয়া দাসমণ্ডলীর নিকট উহা জ্ঞাপন

করেন। অতঃপর পবিত্রাত্মা ভগবানের লীলাতেই নানা স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। এমন কি, কোনও প্রস্তাব এমন ছিল যে, কন্যার পিতা ভূমি সম্পত্তি এবং নগদ সম্পত্তির আংশিক উত্তরাধিকারিত্ব সহ কন্যা সম্প্রদানে অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দাসমণ্ডলীরও ইহাতে কোনও আপত্তির কারণ ছিল না এবং তাহাতে বাস্তবিকও কোনও দৃশ্য দোষ ছিল না। ভাই বৈকুণ্ঠনাথ বাল্যকাল হইতে যে ইষ্ট দেবতার পাদপদ্মে শরণ নিয়াছিলেন, অন্তরে সেই প্রিয়দেবতার সায় পাইলেন না বলিয়াই অনায়াসে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। এতদ্ভিন্নও অনেক বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে। অবশেষে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব শেষে ৩০শে ভাদ্র মা আনন্দময়ী ভাই বৈকুণ্ঠকে চাপিয়া ধরিয়া এই আদেশ করেন, "তুমি আমার মূর্ত্তিমতী নারী প্রকৃতির সহিত মিলিত হও"। ভ্রাতা মার দ্বারাই বাধ্য হইয়া দেবালয়ের উপাসনার শেষকালে মণ্ডলীর নিকট উহা প্রকাশ করেন, এবং মার স্পষ্ট অভিপ্রায় বুঝিয়াই তিনি এই বিবাহ ব্যাপার সুসম্পন্ন বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অত্রত্য পবিত্রাত্মার দাস মণ্ডলীর হস্তেই সমুদয় ভারার্পণ করেন।

"এদিকে বরিশালের অন্তর্গত একটী সম্ভ্রান্ত অথচ গরিব বৈদ্য পরিবারের শ্রীমতী সুখদাসুন্দরী নাম্নী একটি বালবিধবা কন্যা নানা ঘটনা চক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া আমাদের কোনও বন্ধুর পীড়িতা পরিবারের সঙ্গে আমাদের বিধান পল্লীতে আনীতা হন। ইনি বিবাহার্থিনী হইয়াই হিন্দু পিতামাতার স্নেহ ও পারিবারিক বন্ধন অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অত্রত্য দাসমণ্ডলী বিধবাবিবাহের বিরোধী; বিশেষতঃ ভাই বৈকুণ্ঠ ইহাতে একান্তই নারাজ। সুতরাং এই কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইবে ইহা কাহারও

মনে হয় নাই। কিন্তু বিধাতার বিধান কে খণ্ডন করিবে? অত্রত্য দাসমণ্ডলী যখন মার পবিত্রাত্মার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া ভ্রাতার বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, পবিত্রাত্মা ভগবান শ্রীমতী সুখদাকে পাত্রীরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। দাসদলের প্রত্যেকের ইচ্ছা, রুচি এবং ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে যখন ভগবানের এই আদেশ প্রকাশিত হইল, তখন তাঁহারা ভাই বৈকুণ্ঠনাথের নিকট উহা জ্ঞাপন করিলেন। ভ্রাতাও দ্বিধাশূন্যভাবে অন্তরে পবিত্রাত্মা ভগবানের ঐ নির্দ্দেশই প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং যথারীতি শ্রীমতী সুখদাসুন্দরীর বর্ত্তমান অভিভাবক ও মাতুলের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করা হয়। তাঁহারা আহ্লাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া শ্রীমতী সুখদার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাহাতে শ্রীমতী সুখদাও সম্মতা হন।

"এইরূপে বিধাতার বিধানে বিবাহ প্রস্তাব সুস্থির হইয়া গেল। সকলেই মার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে চলিল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু মার কার্য্য এই পৃথিবীতে অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ইহার মধ্যেও দাসদলের অনেক পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতে হইল, এবং তাহাতে মা অল্পবিশ্বাসীদিগকে সমধিক বিশ্বাসী করিলেন। একটী ভয়ানক লোক এই কন্যার চরিত্র সম্বন্ধে নানা প্রকার কুৎসা কাগজে ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবেরা বলিতে লাগিলেন, ভাই বৈকুণ্ঠনাথ আমাদের মধ্যে অকলঙ্ক চরিত্র, ইঁহার সঙ্গে এ বিধবার বিবাহ কোনও মতেই পরামর্শ সিদ্ধ নহে। এদিকে দাসদল মহা বিভ্রাটে পড়িলেন। একদিকে মার আজ্ঞা, অপর দিকে লৌকিক ভয়ানক বাধাবিঘ্ন। একে তো তাঁহারা এক নারীর একাধিক পতি গ্রহণ ভয়ানক পাপ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তৎপর সেই নারী সম্বন্ধে নানা প্রকার কুৎসা জনসমাজে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই বিপদে সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশিনী মার চরণে শরণাপন্ন হইয়া সব বিষয় পরিষ্কার

হইল। যাহারা বিবাহের উপযুক্ত বয়স লাভের পূর্ব্বে বিবাহিতা হয় তাহাদিগের সেই অসময়েই পতি বিয়োগ হইলে তাহাদিগকে প্রকৃত বিধবা বলা যায় না। তথাপি যদি তাহারা এইটি বুঝিতে পারে যে, অসময়ে পিতা মাতা কর্ত্তৃক যাঁহার হস্তে সমর্পিতা হইয়াছিল, তিনিই তাহার স্বামী ছিলেন এবং চিরজীবন সেই স্বামীর বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে, তবে তাহাদিগকে পুনরায় বিবাহে যাহারা প্রবৃত্তি দান করে, তাহারা অন্যায় কার্য্য করে। কিন্তু যাহারা বাল্যকালে বিধবা হইয়া সেই মৃত স্বামীকে আর স্বামীরূপে অন্তরে ধারণা করিতে পারে না, তাহারা বিবাহিতা হইতে চাহিলে বিবাহ দেওয়া মার আজ্ঞানুসারে হইতে পারে। সুতরাং এই বিধবা যখন বাল্যকালের বিধবা তখন এই বিবাহে আপত্তি হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ইঁহার নানা প্রকার কুৎসা কলঙ্ক রটনা হইতেছিল, যাহার সত্যাসত্য সুন্দররূপ নির্দ্ধারণের উপায় নাই, (একটি দুষ্ট লোক ভিন্ন আর সকলেরই নিকট বালিকার পক্ষে সংবাদ পাওয়া যায়) তেমন ভগিনীর সহিত এমন সাধু ভ্রাতার বিবাহ দেওয়া কি সঙ্গত ? তাহাও পবিত্রাত্মা ভগবান খণ্ডন করিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিলেন, "মলিন বলিয়া যদি তোরা ইহাকে অগ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা করিস্, তবে তোরা মলিনাত্মা হইয়া আমার পবিত্রাত্মার সঙ্গে মিলিত হইতে কি প্রকারে আশা করিতে পারিস্ ?" দাসদল একেবারে অবাক্ হইলেন। সম্পূর্ণরূপে মার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হউক বলিয়া দাসদল মস্তক অবনত করিলেন। "মা হস্তে তুলিয়া বিষ দিলেও তাহা অমৃত জানিয়া পান করিতে হইবে" এই প্রত্যাদেশ পাইয়া ভাই বৈকুণ্ঠনাথও মার চরণে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। আশ্চর্য্যরূপে মার কার্য্য হইল। মা এই ব্যাপার স্বহস্তে সুসম্পন্ন করিলেন।

"বিগত ১৮ই পৌষ শনিবার বিধানপল্লীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ

সেন মহাশয়ের বাটীতে শুভ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহের কোনও কিছু আয়োজন ছিল না। মার কার্য্য মা-ই নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহার দীন প্রচারক সন্তানের কোন অভাবই তিনি রাখিলেন না। আশ্চর্য্যরূপে কপর্দ্দক সম্বল শূন্য অবস্থায় বিবাহ ব্যাপার বাহিরেও এক প্রকার সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। আনন্দময়ী মা পুরুষ প্রকৃতি যুগলরূপে প্রসন্ন হইয়া প্রকাশিত হইলেন। উপাসনান্তে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইল। অতঃপর বন্ধুবান্ধবদিগকে একখানি রুটির দ্বারা একশত লোককে পরিতুষ্টির সহিত ভোজন করানর ন্যায় সামান্য খেচরান্নের দ্বারা ভোজন করান হয়। কিন্তু সকলেই মা লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার হস্তে ভোজন করিয়া অতীব পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিলেন।

"ভাই বৈকুণ্ঠ সামান্য সাংসারিক ভাবে এই ব্যাপারে লিপ্ত হন নাই। তিনি আপনার ইষ্ট দেবতার আদেশে ইচ্ছা, রুচি, মত * * * * বিসর্জ্জন দিয়া মার ইচ্ছাকে জয়যুক্ত হইতে দিলেন। মা ইহাতে বাস্তবিকই তাঁহাকে আপনার প্রসন্ন মুখ দেখাইয়া কৃতার্থ করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মার চরণে এই প্রার্থনা করি—শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার বিবাহিত জীবনে—তাঁহার এবং তাঁহার পত্নীর জীবনে মার ইচ্ছা সুসম্পন্ন হউক—আমাদের পূর্ব্ব বঙ্গে নির্লিপ্ত সংসারী জীবনের একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হউক।"

(বঙ্গবন্ধু, মঙ্গলবার ২১শে পৌষ, ১২৯৩ সন)

বিহারী দাস আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য নানা কথা প্রচার করিয়াছিল, সুখদাকে বিবাহ করিলে বিহারী আমার প্রাণ নাশ করিবে ইহাও বলিয়াছিল। বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া একটা অকাণ্ড ঘটাইবে ইহাও শোনা গিয়াছিল। তজ্জন্য বন্ধুরা পুলিশ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবাহের পরে সে নিরাশ মনে ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তৎপর আর তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

গৃহ-ধর্ম্ম।

সুখদা প্রচারকের গৃহিণী হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের সাংসারিক অবস্থা যাঁহারা জানেন তাঁহারা বলিতেন, সুখদা গৃহহীনের গৃহিণী হইলেন, ফলতঃ কার্য্যেও তাহাই হইল। তখন ঢাকার প্রচারক-গণ আর্ম্মানীটোলার পল্লীতে কয়েক খানি ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতেন। আমি অবিবাহিত ছিলাম, কখন ছাপাখানা বা প্রচার আফিসে, কখন কোন বন্ধুর গৃহে বাস করিতাম, যখন যেখানে ব্যবস্থা হইত, তথায় আহার করিতাম। এই অবস্থায় আমার সহিত সুখদার বিবাহ হইল। বিবাহের পরও দুজনে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে আহার করিতে লাগিলাম, রাত্রিতে কোনও বন্ধুর গৃহে বাস করিতাম। কিছু দিন এইরূপে চলিল। তৎপর কোনও বন্ধুর বাটীর একটী ক্ষুদ্র কুঠরীতে আমাদের থাকিবার স্থান হইল এবং একত্রে আহারাদি করিবার ব্যবস্থা হইল। সুখদা স্বহস্তে সমুদয় কার্য্য করিয়া দুজনের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া অতি যত্নে স্বামীসেবা করিতেন। পিতৃগৃহে চিরদিন মাতার নিকট থাকিতেন, কখন নিজে রন্ধন করেন নাই, সুতরাং প্রথমে বড় অসুবিধা বোধ হইত। কিন্তু মনের আগ্রহ ও উৎসাহের নিকট কোন বাধাই দাঁড়ায় না, ক্রমে সুখদা সকল কর্ম্মই শিখিলেন, গৃহ কর্ম্মে বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিলেন।

এই সময়ে ঢাকার প্রচারকগণ মধ্যাহ্নে সকলে একত্রে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতেন, রাত্রিতে স্ব স্ব পরিবারে আহার করিতেন। আমি দেখিলাম, কেবল স্বামী স্ত্রীতে আহারাদি করা সাংসারিক ভাব, ইহার মধ্যে পরসেবার কোন সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। তদনুসারে পরলোকগত উৎসাহী যুবক অন্নদাপ্রসন্নের রাত্রির আহারের ভার সুখদা গ্রহণ করিলেন। আমাদের সংসার করিবার মত তৈজস পত্র কিছুই ছিল না, প্রভুর কৃপায় ক্রমে ক্রমে সকল অভাবই দূর হইতে

লাগিল। সুখদার গৃহ কর্ম্মে শৃঙ্খলা, অনুরাগ ও শ্রদ্ধা নিষ্ঠার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইত।

প্রথম সন্তান—১২৯৪ সালের ১৪ই ভাদ্র মঙ্গলবার সুখদার প্রথম সন্তান শ্রীমতী প্রেমলতার জন্ম হয়। গৃহে চাকর চাকরাণী কেহ নাই, আত্মীয়া স্ত্রীলোকও কেহ নাই, প্রসূতির গৃহে থাকিবার জন্য কোন স্ত্রীলোকের বন্দোবস্তও করা হয় নাই। কিন্তু এই দীন পরিবারের সকল ভার যাঁহার হস্তে, তিনি ত আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। প্রসবের অল্পক্ষণ পর সহসা কোথা হইতে একটী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক চাকুরীর প্রার্থী হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি উহাকে প্রভুর প্রেরিত মনে করিয়া সুখদার পরিচর্য্যার কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। এক মাস কাল অতি যত্নের সহিত সে সুখদার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল।

নীমতলীর নূতন বাড়ী—আরমাণীটোলার পল্লীতে সকলের স্থান সমাবেশ হইত না বলিয়া নীমতলীর পুরাতন নবাব বাড়ী ক্রয় করিয়া তথায় বিধানপল্লী প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রচারকগণ ও শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয় প্রভৃতি সম্পন্ন ব্রাহ্মগণ এই পল্লীতে স্থান গ্রহণ করিয়া গৃহ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আমার অর্থ বিত্ত কিছুই নাই, আমার জন্য স্থান হইবে কিরূপে? বিধাতার কৌশলে আমার জন্যও কিঞ্চিৎ স্থান হইল। শ্রীনাথ বাবু এই পল্লীতে এক খণ্ড স্থান রাখিতে ইচ্ছা করিয়া কিছু টাকা পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার স্থান রাখা হইল না। উক্ত টাকায় তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে আমার জন্য স্থান ক্রীত হইল। তথায় দুই খানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইল। এত দিনে আমাদের নিজস্ব গৃহ হইল, সুখদা এই বাড়ীতে আসিয়া অতিশয় আনন্দ ও আরাম প্রাপ্ত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি নিজ-হস্তে সমস্ত গৃহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন, অতি যত্নে সন্তান পালন করিতেন,

তদুপরি একান্ত শ্রদ্ধার সহিত স্বামী ও তাঁহার বন্ধুগণের যথাসাধ্য সেবা করিতেন। কন্যা লাভ করিয়া সুখদার বড় আহ্লাদ হইয়াছিল। যে রমণী বৈধব্য দশায় চির দুঃখে জীবন যাপন করিবে বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল, তাহার পক্ষে সন্তান লাভ করা, এবং সেই সন্তানের লালন পালন করা কত সুখের বিষয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

ঘরসংসার ও স্বামী কন্যা লাভ করিয়া সুখদা ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলিয়া যান নাই। তিনি প্রত্যহ স্বামীসহ ভগবানের উপাসনা করিতেন, সুযোগ পাইলেই পল্লীস্থ দৈনিক উপাসনায় উপস্থিত থাকিতেন।

পুত্রসন্তান—প্রেমলতার দুই বৎসর বয়সের সময় সুখদার একটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এই শিশু অতিশয় সুশ্রী ও গৌরাঙ্গ হইয়াছিল। পুত্র লাভে সুখদার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি আমার পিতার নামের সঙ্গে যোগ রাখিয়া পুত্রের নাম দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ রাখিলাম। সুখদা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে একাকিনী এই দুইটী শিশু সন্তানকে যে ভাবে লালন পালন করিতেন, এবং তদুপরি রুগ্ন স্বামীকে যেরূপ যত্নে সেবা শুশ্রূষা করিতেন, তাহা দেখিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রতি কিঞ্চিৎ নির্ভর থাকাতে নানা অভাব দুঃখের মধ্যেও তাঁহার মুখের প্রসন্নতা দূর হয় নাই। ঈশ্বরের প্রতি সুখদার কেমন বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল, তাহার একটী দৃষ্টান্ত আমার স্মৃতিপুস্তক হইতে গৃহীত হইল।

স্মৃতিলিপি—২৭শে বৈশাখ রবিবার, ১২৯৫—"মন্দিরের উপাসনার পর বাড়ী আসিতে গৌণ হইল। প্রবল ঝড় বহিতেছিল, ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরের দুয়ার অল্প খোলা রাখিয়া সুখদা ভীত অন্তরে আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন, তখন তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, পরম জননী তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। আমি বাড়ী আসিয়া আহারাদি করিলাম, তৎপর ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে প্রসঙ্গ করিতে আগ্রহ

হইল, কিন্তু ঝড় বৃষ্টির জন্য ঘরের বাহির হইতে পারিলাম না। পরম মাতার শরণাপন্ন হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তিনি কৃপা করিয়া একটু তাঁহার সহবাস সম্ভোগ করিতে দিলেন। সুখদা জীবনে ভগবানের করুণার কথা বলিতে লাগিলেন। বিধান ও নিরাকার ঈশ্বরের উপলব্ধি বিষয়ে অনেক কথা হইল। সময় সময় তাঁহার ব্রহ্মোপলব্ধি হয় ইহাও স্বীকার করিলেন। এইরূপ মধুর আলাপে মার প্রসন্নতা বিশেষভাবে অনুভূত হইল।"

মাতার এইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব শিশুদের চরিত্রেও কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইতেছিল। আমার স্মৃতিপুস্তকের একটী ঘটনা তাহার দৃষ্টান্ত—"এক দিন সায়ংকালে প্রবল ঝড় বহিতেছিল, প্রেমলতা ভয় পাইয়া আমাকে ডাকিয়াছিল; আমি শীঘ্র বাড়ী আসিব না শুনিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, মা, তুমি হরি বল! তাহার মা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন, আর মেয়ে শান্ত হইল।"

এই সময়ে সুখদা শ্বশুরগৃহে যাইয়া তাঁহার শাশুড়ীঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইলেন। আমি পুত্র কন্যা ও পত্নীসহ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে স্বীয় পৈতৃক বাসগৃহে গমন করিলাম। ঢাকা হইতে নৌকা পথে ৩।৪ দিনে তথায় যাওয়া যায়। আমার মাতাঠাকুরাণী অতিশয় স্নেহশীলা হইলেও সমাজ ভয়ে অত্যন্ত ভীতা ছিলেন। এই জন্য আমি সহসা বাড়ীতে না যাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামান্তরে স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনীর বাড়ীতে প্রথমে গমন করি। পরে মাতৃদেবীর অনুমতি পাইয়া সপরিবারে বীরসিংহ গ্রামে গমন করি। মাতৃদেবী পুত্রবধু ও পৌত্র পৌত্রী দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিন দিন মাত্র আমরা বাড়ীতে ছিলাম। এই অল্প সময়ে সুখদা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সুমিষ্ট চরিত্রের

আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্ত শ্বশ্রূদেবীর সেই স্নেহ মমতা ভক্তির সহিত স্মরণ করিতেন।

১২৯৮ সালের ৬ই চৈত্র সুখদার তৃতীয় সন্তান শ্রীমতী প্রীতিলতার জন্ম হয়।

পুত্রশোক—১৩০০ সালের আশ্বিন মাসে আমি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ছোটনাগপুরের প্রধান নগর রাঁচিতে যাই, তথায় প্রায় তিন মাস কাল বাস করি। এই সময়ে সুখদা সন্তান কয়টী লইয়া কিছু দিন ময়মনসিংহে থাকেন, তৎপর ঢাকায় আসিয়া নিজ গৃহে বাস করিতে-ছিলেন। ২রা মাঘ অপরাহ্ন তিনটার সময় সুখদা অন্য বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সাড়ে চারি বৎসরের শিশু দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ ক্রীড়াচ্ছলে রন্ধন গৃহে বসিয়া দেশলাই জ্বালাইয়াছিল। সহসা তাহার কাপড়ে আগুন ধরিয়া যায়। শিশু ভয়ে কাহাকেও না ডাকিয়া নিজে নিজে আগুন নিবাইতে চেষ্টা করে, গৃহের জলপাত্রগুলিতে জলের সন্ধান করিল, সকল গুলিই শূন্য ছিল, জল পাইল না। তখন বালক ভয়ে চীৎকার করিয়া নিকটস্থ মহিম বাবুর গৃহে দৌড়িয়া গেল। ততক্ষণে তাহার পশ্চাৎভাগ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। মহিম বাবুর স্ত্রী অবশিষ্ট কাপড়টুকু ফেলিয়া দিলেন। সুখদাও চীৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন এবং প্রাণাধিক সন্তানের অবস্থা দেখিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া শিশুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। যখন ভীষণ যন্ত্রণায় শিশু অধীর হইতেছিল, তখন সুখদা বলিলেন, বাবা, দয়াময়কে ডাক। শিশু উচ্চৈঃস্বরে "দয়াময়ী মা," "দয়াল হরি," বলিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল।

প্রায় ৩৮ ঘণ্টা শিশু জীবিত ছিল। সুখদা মন প্রাণ দিয়া সন্তানের সেবা করিলেন। পল্লীস্থ সকলে যথা সাধ্য সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করাইলেন। ময়মনসিংহে খবর গেল, শ্রীনাথ বাবু রাত্রির গাড়ীতে

চলিয়া আসিলেন। ৪ঠা মাঘ অতি প্রত্যূষে দ্বিজেন্দ্র নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেল। দুঃখিনী জননী পাগলের ন্যায় বিবসা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে ধৈর্য্য ধরিয়া সন্তানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে সুখদা সন্তানদিগকে লইয়া দুর্গানাথ বাবুর গৃহে বাস করিতেছিলেন; প্রাতঃকালে শিশুর শব লইয়া নিজের বাড়ীতে আসিলেন, আপন হস্তে জন্মের মত শিশুর সুন্দর দেহ ধৌত ও স্নান করাইয়া পুষ্প চন্দনে সাজাইয়া দিলেন, ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন, ললাটে চন্দনে হরিনাম লিখিয়া দিলেন। তখন সুখদা যেরূপ ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া শুনিয়া সকলে বিস্মিত ও অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতেছিলেন। শ্মশানবন্ধুদিগকে দেহ ভস্ম আনিতে বলিয়া দিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে সেই ভস্ম সমাধিস্থ করা হয়। শেষ জীবন পর্য্যন্ত দ্বিজেন্দ্রের জন্ম-দিনে ও পরলোক গমন দিনে বিশেষভাবে তিনি প্রার্থনাদি করিতেন।

চতুর্থ সন্তান—১৩০১ সালের ২৫শে কার্ত্তিক সুখদার চতুর্থ সন্তান তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী যোগিনীবালার জন্ম হয়। যোগিনী অষ্টম মাস বয়সে জ্বর বিকারে মরণাপন্ন হইয়াছিল। তাহার মা অতি ধীরতার সহিত অক্লান্ত ভাবে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তখন আমার শরীরও অসুস্থ। তখন রোগ শোক দারিদ্র্য দুঃখ চারিদিক অন্ধকার করিয়া এই দীন পরিবারকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সন্তান ও স্বামী রোগগ্রস্থ, গৃহ জীর্ণ, অন্নবস্ত্রের সংস্থান নাই। প্রচার ভাণ্ডার হইতে যে সামান্য সাহায্য লাভ হইত, তাহাতে একটী লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়াই দুষ্কর। সুখদা এ সকল বহন করিতেন। মন কখন বিকারগ্রস্ত হইত না, তাহা বলা যায় না। তবে ভগবানে নির্ভর রাখিয়া আপন কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবতী থাকিতেন।

ইষ্টক গৃহ—সুখদার ঘর বাড়ীও ভগবানের কীর্ত্তি বিশেষ। অর্থ নাই, বিত্ত সম্পত্তি নাই, ধনবান আত্মীয় স্বজনও নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ভগবানের বিশেষ কৃপায় এই পরিবারের জন্য বিধানপল্লীতে একটুকু নিষ্কর ভূমি লাভ হয়। তদুপরি যে ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, সুখদা স্বামী ও সন্তানগণ সহ অতি সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাতে বাস করিতেন। ক্রমে গৃহ জীর্ণ হইল, যথা সময়ে তাহা সংস্কার করিবার উপায় হইল না। ঝড় বৃষ্টিতে মহা ক্লেশ হইত। এমন সময় হইয়াছে যে গৃহের সর্ব্বাংশেই জল পড়িয়াছে, রাত্রিতে শয্যা গুটাইয়া সন্তানগুলিকে কোলে লইয়া স্বামী স্ত্রীতে অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করা গিয়াছে। কখন কখন সন্তানগুলি ঝড় বৃষ্টির ভয়ে চৌকির নীচে যাইয়া আশ্রয় লইত। অধিকাংশ সময় সুখদা প্রসন্ন চিত্তে এ সকল বহন করিয়াছেন। অনেক সময় গৃহখানি বাসের একান্ত অযোগ্য হইলে আমরা প্রতিবেশীর গৃহে বাস করিতে বাধ্য হইতাম।

প্রতিবেশী প্রচারক ভ্রাতাদের সকলেরই পাকা বাড়ী হইল, সুখদারও মনে বড় সাধ যে তাঁহাদেরও একটী পাকা ঘর হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পল্লীর কেহ কেহ স্বল্প মূল্যে কতকগুলি পুরাতন লোহার সাতীর (কড়ি) ক্রয় করিয়াছিলেন। সুখদা স্বীয় হাতের বালা বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে কয়েকটী সাতীর ক্রয় করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, ওকি কর, কেবল সাতীরে কি ঘর হইবে? সুখদা গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, ভগবান ঘর করিয়া দিবেন। গৃহ হইবার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সাতীর কিনা হইয়াছিল।

প্রভু পরমেশ্বর তাঁহার পদাশ্রিত জনের সকল অভাব মোচন করেন। তিনি যথা সময়ে সুখদার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন। দীনবৎসল, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তাঁহার নাম, সে নামের মহিমা এই ক্ষুদ্র দীন পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই পরিবারের হিতৈষী বন্ধু শ্রীনাথ বাবুর

উদ্যোগে এবং প্রধানতঃ তাঁহারই অর্থানুকুল্যে একখানি সুন্দর পাকা গৃহ নির্ম্মিত হইল। সুখদার স্নেহাস্পদ দেবর শ্রীমান যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষও যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৩০২ সালের ১লা কার্ত্তিক এই গৃহের প্রতিষ্ঠা হইল। সুমিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা যোগে গৃহে প্রবেশ করা হইল। সুখদা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সমাগত ধর্ম্মবন্ধুদের সেবা করিলেন। শ্রীনাথবাবু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। এই গৃহের জন্য সুখদা সর্ব্বদাই ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেন।

শেষ সন্তান—১৩০৩ সালের ৭ই ভাদ্র শনিবার সুখদার পঞ্চম সন্তান অমিয়াবালার জন্ম হয়।

দারিদ্র্য ও সেবা—বিবাহের পূর্ব্বেই সুখদা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রচারকের সঙ্গে বিবাহ হইলে জীবিকার কোনও নিশ্চয়তা নাই। ভগবানের হাতে সমস্ত ভার, তিনি দিলে আহার হইবে, না দিলে হইবে না। অধিকাংশ সময়ই দিনের অন্ন দিন যুটিত। পূর্ব্ব দিনের সঞ্চিত কিছু প্রায়ই গৃহে থাকিত না। যে দিন গৃহে যাহা থাকিত তাহা লইয়াই সুখদা রান্নার জন্য প্রস্তুত হইতেন। চাল ডাল নাই বলিয়া তিনি আয়োজনে ক্ষান্ত থাকিতেন না, তরকারী কি মসলা যাহা থাকিত তাহাই প্রস্তুত করিয়া বসিয়া থাকিতেন। আমি কৌতুক করিয়া বলিতাম, "চাল নাই, ডাল নাই, কাঠ নাই, বাটনা কুটনা কর কোন্ আশায়?" তিনি বলিতেন, "আমার হাতে যাহা আছে তাহা লইয়া প্রস্তুত থাকি, বিধাতা আহার দিবেন।" কদাচিৎ দিনান্তেও আহার মিলিত, কখনও লবণ ভাত মিলিত। এ সকল অভাব দুঃখে পড়িয়া তিনি স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। অন্নদাতা না দিলে কখনও অন্ন মিলে না, এ কথায় তাঁহার অটল আস্থা ছিল। বস্ত্র বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, যখনই আমার কাপড়ের অভাব হয়,

তখনই ভগবান উহা যোগাইয়া থাকেন। তিনি কখনও আমাকে লজ্জা দেন নাই।

আমি এক প্রকার চিররুগ্নই ছিলাম, আমার জন্য ঔষধ পথ্যের প্রয়োজন হইত; দুগ্ধপোষ্য শিশুগুলির জন্য দুধ চাই, তাহার কোনও সংস্থানই ছিল না। নিজে খাটিয়া যাহা সম্ভব সুখদা তাহা করিতেন। রুগ্ন স্বামীকে ও শিশুদিগকে যে দুধ দিতে পারেন না, এজন্য তাঁর মনে বড় কষ্ট হইত। সুখদার দাদা শ্রীনাথ বাবু এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। এই সময়ে সুখদা শ্রীনাথ বাবুর নিকট হইতে পনরটী টাকা চাহিয়া লইলেন। কেন লইলেন, তাহা বলিলেন না। ঐ টাকায় তিনি একটী সামান্য গাভী ক্রয় করিলেন। স্বহস্তে উহাকে ঘাস খাওয়াইতেন, পল্লীর অন্যান্য প্রচারকদের গৃহ হইতে ভাতের মাড় সংগ্রহ করিয়া উহাকে দিতেন। সুখদার যত্নে গাভীটী বিলক্ষণ দুগ্ধবতী হইল, প্রত্যহ আড়াই সেরেরও অধিক দুগ্ধ দিত। এইরূপ কঠোর পরিশ্রমে সুখদা স্বীয় স্বামী ও সন্তানগণের পরিচর্য্যা ও অভাব মোচন করিয়া গিয়াছেন।

সুখদা যে কেবল নিজ পরিবারের জন্য পরিশ্রম করিতেন তাহা নহে, ইহার উপর আবার সুবিধা পাইলেই পরসেবা করিতেন। পাড়াতে কাহারো বাড়ী বিবাহাদি অনুষ্ঠান উপস্থিত হইলে সুখদা গায়ে খাটিয়া সাহায্য করিতেন। ঢাকা নববিধান সমাজের বার্ষিক উৎসবের সময় নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ আসিতেন, অনেক সময় তাঁহাদের আহারের সুব্যবস্থা হইত না। সুখদা কয়েক বৎসর অতিশয় আগ্রহের সহিত এই ভার গ্রহণ করিয়া সকলের সেবা করিয়াছিলেন। উৎসবের সময় পক্ষাধিক কাল, প্রত্যহ দুই বেলা স্বহস্তে রন্ধন ও পরিবেশন করিতেন।

বরদা নামে একটী অনাথা বালিকা সুখদার আশ্রয়ে কয়েকদিন

প্রতিপালিতা হয়। এই বালিকা দ্বারাই ঢাকা উদ্ধারাশ্রমের প্রথম সূত্রপাত হয়। এক্ষণ সে বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতেছে। নয়ানী নাম্নী একটী মৃতপ্রায় স্ত্রীলোককে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী কুড়াইয়া লইয়া আসেন। সুখদা তাহাকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়া অনেক দিন প্রতিপালন করিয়াছিলেন। নয়ানী নির্ব্বোধ (idiot) ও অকর্ম্মা লোক ছিল। তদুপরি আবার অতিশয় কোপনস্বভাবা ও অসন্তুষ্টা ছিল। সুখদার প্রতি অতিশয় অত্যাচার ও আব্দার করিত। কিছুদিন পরে রোমান কাথলিক ভগ্নীসম্প্রদায় তাহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার ক্রোধ, অত্যাচার ও অবাধ্যতার জন্য উহাকে পুনরায় সুখদার নিকট রাখিয়া যান। সুখদা তাহার সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া আপনার ঘোর অভাব দুঃখের মধ্যেও তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। সেও সুখদাকে খুড়ীমা বলিয়া ডাকিত এবং ক্রমে তাঁহার অনুগত হইয়াছিল।

আত্মীয় সেবাতেও সুখদার বিলক্ষণ আহ্লাদ হইত। অতি দরিদ্রাবস্থাতেও তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিতে তিনি যথাসাধ্য যত্ন করিতেন, ধার করিয়াও সে কর্ত্তব্য পালন করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ দেবর যোগেন্দ্র অনেক দিন তাঁহার নিকট থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছেন, তিনি যোগেন্দ্রকে বড় ভাল বাসিতেন, যোগেন্দ্রও বধূঠাকুরাণীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিল। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াই সুখদা শ্রীনাথ বাবুর আশ্রয়ে ছিলেন, তিনি তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতেন। রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যে তাঁহাকে পরমাত্মীয় ও সহায় বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীনাথ বাবুও শেষ সময় পর্য্যন্ত ভগ্নীনির্ব্বিশেষে সুখদার সকল অবস্থায় সহায়তা করিয়াছেন।

উপসংহার—পরলোক যাত্রা।

১৩০৪ সাল আসিল। এই সময় সুখদার শরীর মনের বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি দেখা গেল। তাঁহার নূতন গৃহ আত্মীয় জনে পূর্ণ হইল। এই সময়ে ময়মনসিংহ হইতে শ্রীমতী লক্ষীমণি গুপ্তা নামে একটী ব্রাহ্মিকা মহিলা একটী স্তন্যপায়ী শিশু লইয়া তাঁহার গৃহে আসিয়া ঢাকা মেডি-কেল স্কুলে পড়িতেছিলেন। আমার দ্বিতীয়া ভাগিনেয়ী কুমারী পুণ্যলতা মামীর নিকট থাকিয়া ইডেন ফিমেল স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সুখদার ক্ষুদ্র গৃহ লোকে পূর্ণ হইল, কাজ কর্ম্ম বাড়িয়া গেল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উৎসাহ, অনুরাগ ও পরসেবার প্রবৃত্তি আরও প্রবল হইল। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রদীপ আরও জ্বলিয়া উঠিল। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম মহিলা শিশুটীকে গৃহে রাখিয়া স্কুলে যাইতেন, তখন সুখদার ক্রোড়েও স্তন্যপায়ী শিশু ছিল, এমন সময় হইত যখন সুখদা দুই ক্রোড়ে দুই শিশুকে লইয়া আপন স্তন্য পান করাইতেন, উভয়ের জননীর স্থান গ্রহণ করিতেন।

দেখিতে দেখিতে দুরন্ত বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সুখদার কর্ম্মের বিরাম নাই, রৌদ্র বৃষ্টি জ্ঞান নাই—তিনি আপনার স্বাস্থ্য সুখকে সর্ব্ব-দাই তুচ্ছ করিতেন, অসময়ে স্নানাহার সর্ব্বদাই ঘটিত। মানুষের শরীর আর কত সহিবে? ২৭শে শ্রাবণ সুখদার ভয়ানক জ্বর হইল। ক্রমে রোগ বাড়িয়া চলিল, কোনও চিকিৎসাতেই ফল হইল না। ক্রমে নিউমোনিয়া ও মস্তিষ্কের বিকার দৃষ্ট হইল। সংবাদ পাইয়া ময়মনসিংহ হইতে শ্রীনাথ বাবু আসিলেন, অর্থ ও শারীরিক পরিশ্রমে যাহা সম্ভব, তিনি অক্লান্তভাবে তাহা করিলেন।

প্রথমতঃ ডাক্তার নেপালচন্দ্র রায় চিকিৎসা করিতেছিলেন, পরে ঢাকার তৎকালীন প্রধান ডাক্তার বাবু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিকিৎসা করেন। শ্রীমান পরেশরঞ্জন রায় তখন লাহোর মেডিকেল

কলেজে পড়েন, ছুটী উপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন, তিনিও অক্লান্তভাবে সুখদার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমে রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিল, সুখদা একেবারে অচেতন হইয়া পড়িলেন। পীড়ার প্রথম সময়েই তিনি বুঝিয়াছিলেন, এবার তাঁহার শেষযাত্রা। যতদিন জ্ঞান ছিল, সকলের সংবাদ লইতেন, শিয়রে বসিয়া উপাসনা করিলে শান্তমনে উহাতে যোগ দিতেন। দাদা আসিলেন কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন। শ্রীনাথ বাবু আসিলে, তাঁকে বলা হইল, তিনি আগ্রহের সহিত চক্ষু মেলিয়া করযোড়ে তাঁকে নমস্কার করিলেন। অতঃপর তিন চারিদিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া পীড়ার ষোড়শ দিনের মধ্য রাত্রিতে দেহলীলা শেষ করিয়া নিত্যধামে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সকল যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি হইল। পল্লীর ও অন্য স্থানের অনেকগুলি নরনারী মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস পড়িয়া গেলে শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়, শ্রীনাথ বাবু ও আমি প্রার্থনা করিলাম। অবশিষ্ট রজনী কেহ কেহ শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া নাম গানাদি করিয়া যাপন করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে উত্তমরূপে শব স্নান করান হইল, লালপেড়ে নববস্ত্র পরাইয়া সিন্দুর ও পুষ্পচন্দনে দেহ সজ্জিত হইল। মুহুর্মুহু হরিনাম উচ্চারিত হইতে লাগিল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মনাম গ্রহণ করিলেন, প্রার্থনাদি হইল। কন্যারা স্নেহময়ী জননীর পদধূলি গ্রহণ করিল, মায়ের মুখ শেষ দেখিয়া লইল। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মনাম করিতে করিতে বন্ধুগণ শব স্কন্ধে লইয়া পল্লীর বাহির হইলেন। তখন প্রেমলতা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আবার মাকে দেখিবার জন্য দৌড়িয়া পল্লীর বাহিরে গেল। শব অবতরণ করা হইলে আবার মায়ের মুখ দেখিয়া, "মা, আমায় কার কাছে রাখিয়া যাস্, আমি কার কাছে থাকিব" এই কথা বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল। বালিকার সে ক্রন্দনে

পাষাণও গলিয়া গেল—পথের লোক দাঁড়াইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

চারিটী অপোগণ্ড শিশু ও রুগ্ন স্বামীকে পশ্চাতে ফেলিয়া—আপনার জীবনের ব্রত শেষ করিয়া সুখদা অমর ধামে চলিয়া গেলেন। এই ক্ষুদ্র জীবনে ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি,—তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবিধ।

১৮০৯ শকের আষাঢ় মাসে নীমতলী নূতন বিধানপল্লী স্থাপনের উদ্যোগ হয়। আর্ম্মানীটোলায় মাত্র শ্রীযুক্ত গোপী বাবু, দুর্গাদাস বাবু, বঙ্গ বাবু ও কৈলাশ বাবুর গৃহ ছিল। আর কাহারও বাড়ী হয় নাই। গোপী বাবু তাঁহার বাড়ী বিক্রি করিলেন, তৎসঙ্গে উপাচার্য্য মহাশয়ের গৃহ বিক্রি করা হইল। তখন প্রচারক পরিবার বৃদ্ধি পাইয়াছে, সকলেরই গৃহের প্রয়োজন।

৭০০০ সাত হাজার টাকা দিয়া পুরাতন নবাব বাড়ী গোপী বাবুর নামে ক্রীত হয়। পশ্চিমদিকের অর্দ্ধাংশ বিলি বণ্টনের ভার আমার উপর থাকে, এবং পূর্ব্বার্দ্ধাংশ তিনি নিজে গ্রহণ করেন। আমার হাতে ভার দিবার হেতু, গোপী বাবু কিছু গরম মেজাজের লোক, অন্য নানা জনের সঙ্গে বনি বনাও না হইতে পারে বরং বিসম্বাদ হইবারই বেশী সম্ভাবনা।

দুঃখী গরিবের সহায় হরি। তাঁহার সাহায্যে আমি সমুদয় বিঘ্ন অতিক্রম করিলাম।

আমার জন্য প্রায় সাত কাঠা জমি রাখা গেল। সকলের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ, প্রাচীর ইত্যাদি দিয়া বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিলাম। একবার প্রাতে যাইয়া কাজ দেখিতাম, আবার দুপুরে আহারান্তেই সেখানে যাইতাম। প্রায় দেড় মাস কাল অনবরত পরিশ্রম করিয়া পল্লী নির্ম্মাণ করিলাম। আমার জন্য আর গৃহাদি কিছু করিব না এই সঙ্কল্প ছিল। কেন না ঋণ করিয়া বাড়ী করা আমার অভিপ্রায় বিরুদ্ধ।

কিন্তু প্রভু তাঁহার দাসের জন্য ব্যস্ত। গোপীবাবু আমার ঘরের জন্য দশটী টাকা দিলেন। আরো কিছু সাহায্য পাওয়া গেল। তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র দুখানি পর্ণ কুটীর নির্ম্মিত হইল।

১৪ই ভাদ্র আমাদের প্রথম সন্তান শ্রীমতী প্রেমলতার জন্ম হয়। ১৯শে ভাদ্র নগরকীর্ত্তন করিয়া নূতন পল্লীতে প্রবেশ করা হইল।

১৮১০ শকের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে প্রভুর চরণে প্রার্থনা করিয়া ধুবরী অভিমুখে যাত্রা করি। নৌকাতে প্রাণসখার সহবাস সম্ভোগ হইল। রাত্রিতে সাভার গ্রামে থাকি। প্রতিপালকের লীলা বোঝা ভার! অপ্রত্যাশীত ভাবে অন্ন মিলাইয়া দিলেন। সাভার হইতে এক ষ্টীমারে এলাসীন, তথা হইতে অন্য ষ্টীমারে সিরাজগঞ্জ, আবার আর এক ষ্টীমারে ধুবরী যাই। জল বায়ু পরিবর্ত্তনই এ যাত্রার উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে প্রচার যতটা সম্ভব হইল।

প্রায় মাসাধিক কাল ধুবরী বাস করি। প্রায় প্রতিদিন উপাসনা, কিম্বা প্রসঙ্গ হইত। সামাজিক উপাসনা, ছাত্রসমাজের উপাসনা ও উৎসব এবং সঙ্গত ইত্যাদিতে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এক দিনের সঙ্গতের আলোচনার মর্ম্ম এখানে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

প্রঃ—সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত ঈশ্বর মৃণ্ময় পুতুলের ভিতরেও আছেন। পুতুলের ভিতরে তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া অর্চ্চনা করিলে ক্ষতি কি? তদ্দ্বারা কি তাঁহাকে পাওয়া যায় না?

উঃ—মানবীয় কল্পিত প্রণালীতে কখনও ব্রহ্মদর্শন লাভ হয় না।

ভগবান তাঁহার আপনার প্রণালীতে কৃপাগুণে আত্মাতে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে কল্পনা, চিন্তা, ভাবনা বিবর্জ্জিত হইয়া প্রমুক্ত অন্তঃকরণে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি স্বীয় কৃপাগুণে প্রকাশিত হন। ইহার মধ্যে পুতুলের স্থান কোথায়?

ধুবরী বাস সময়ে সহধর্ম্মিণীর পত্রে জানিতে পাইলাম, শ্রীমতী

হেমন্তশশীর সঙ্গে দুর্গামোহন বাবুর বিবাহ হইয়াছে। শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। বাল-বিধবার বিবাহ নীতি-সঙ্গত। কিন্তু উপযুক্ত বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে যাঁহারা বিবাহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পুনর্ব্বিবাহ অতি গর্হিত কর্ম্ম।

২১শে আষাঢ় ছাত্রসমাজে এই মর্ম্মে উপদেশ হয়—যুবকগণ কল্পনা-প্রধান। কল্পনার চক্ষে তাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ ও সংসারকে অতি-রঞ্জিত করিয়া দেখেন ও তাহাতে মুগ্ধ হন। সত্য শিব সুন্দর হরিকে পাইলে আর এই কল্পনার পশ্চাদ্ধাবিত হইতে হয় না।

ধুবরী হইতে ঢাকা ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভগবান চক্রান্ত করিয়া দার্জ্জিলিং লইয়া চলিলেন; অযাচিত ভাবে পাথেয় ইত্যাদি যোগাড় করিয়া দিলেন। ২৫শে আষাঢ় ধুবরী ছাড়িয়া কুড়িগ্রামে পৌঁছি। সেখানে কয়েকজন ভদ্রলোক লইয়া উপাসনা ও উপদেশ হইল। তৎপর জলপাইগুড়ি জালাল মিঞাদের সঙ্গেও উপাসনাদি হয়।

খর্সং পাহাড়ে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শৈলাশ্রমে তিন দিন তীর্থবাস করি। স্নানান্তে তাঁহার সঙ্গে উপাসনা ও রাত্রিতে প্রসঙ্গ হইত। অহঙ্কার নাশ সম্বন্ধে এই প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে যেরূপ প্রসঙ্গ হইয়াছিল এখানে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিলাম।

অহঙ্কার বৃথা, আমার প্রাণ, জ্ঞান, বুদ্ধি সকলই ঈশ্বরের। আমার শরীর মন, ভিতর বাহির সকলই তাঁহার। তাঁহা দ্বারা আমি এমনি আবদ্ধ যে তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার এক চুলও যাইবার সাধ্য নাই, আমার কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। এমন করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে আর কি লইয়া অহঙ্কার করা যায়?

আমি কি? আমি একটী সত্তা বোধ মাত্র। এই সত্তাও ঈশ্বরের সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত। তার পর জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম, কর্ত্তৃত্ব, শক্তি যাহা

লইয়া অহঙ্কার করি তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের। তিনিই আমার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শক্তি হইয়া আছেন। তাঁহা ভিন্ন এ সকলের অস্তিত্ব নাই। এইরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে, তবে আমিত্ব দূর হয়। ব্রহ্মপরিচয় ও আত্মপরিচয় এই দুইটী হওয়া চাই।

তাঁহার পরিবার আমাকে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরিচয়-পত্র লইয়া দার্জ্জিলিং বাবু তারাপ্রসন্ন রায়ের বাসায় কয়েক দিন বাস করি। প্রায় একপক্ষ কাল হিমাচলে বাস করি। পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নির্জ্জনে ভগবান আপনার করুণা গুণে প্রকাশিত হইয়া কৃতার্থ করিলেন, তাঁহার মধুময় সহবাস সম্ভোগ করিতে দিয়া প্রাণ তৃপ্ত করিলেন। যেমন অযাচিত ভাবে জীবন দান করিয়াছেন তেমনি আপনার গুণে তাঁহার পবিত্র সহবাস দান করিলেন, যাহার যোগ্যতা আমার কিছুই নাই।

নীচে চলিয়া আসিবার সময় থর্সং পাহাড়ে পোষ্ট মাষ্টারের আগ্রহে এক দিন তাঁহার গৃহে বাস করি। পোষ্ট মাষ্টার ট্রেণের গার্ডকে বলিয়া আমাকে বিনা ভাড়ায় শিলিগুড়ি পাঠাইয়া দিলেন। পথে আসিতে আসিতে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কার্য্য নীতি সঙ্গত হইল কি? তিনি বলিলেন "না"। তৎপর আমি গার্ডকে ভাড়ার টাকা দিয়া একখানা রসিদ লইলাম। সব স্থানেই সয়তান প্রলোভন বিস্তার করে, প্রভু ভিন্ন কে আর দুর্ব্বল দাসকে রক্ষা করে? জলপাইগুড়ি দুই দিন থাকিয়া জালাল মিঞা ও আরো দুই তিনটী বন্ধু লইয়া উপাসনাদি হইল। দিঘাপাতীয়া কালীনারায়ণ বাবুর বাসায় ও কয়েক দিন উপাসনাদি হইল। ১৭ই শ্রাবণ ঢাকায় যাই।

কার্ত্তিক মাসে পূজার ছুটীর সময় ঢাকার উকীল বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস ও রেবতী বাবু প্রভৃতি শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাযোগে পদ্মা নদীতে ভ্রমণে গমন করেন। ধর্ম্ম

জীবনের সাহায্য পাইবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া যান। ২রা কার্ত্তিক রবিবার আমরা ঢাকা পরিত্যাগ করি। সায়ংকালে রবিবাসরীয় সামাজিক উপাসনা নৌকাতেই করা গেল। যেমন নদীর বিশুদ্ধ বায়ুতে শরীর সুস্থ হয়, তেমন ভগবানের বর্ত্তমানতার বিশুদ্ধ বায়ুতে আধ্যাত্মিক জীবন সুস্থ থাকে। তাঁহার পবিত্র বিদ্যমানতার আকাশে বাস করিতে হইবে। এই মর্ম্মে উপদেশ হইল।

পদ্মার দুই পারে বহর, ভাগ্যকুল, রামনগর, চৌদ্দরসী, মানিকদহ, হাসেরকান্দি প্রভৃতি গ্রামে উপাসনা, বক্তৃতা, প্রসঙ্গ ও সঙ্গীতাদি দ্বারা প্রচার কার্য্যও হইয়াছিল। আর নৌকাতে প্রতিদিন উপাসনা, প্রার্থনা, আলোচনা, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত হইত। প্রায় পক্ষাধিককাল বেশ আধ্যাত্মিক ও শারীরিক সম্ভোগ হইল। এযাত্রায় ভগবান সকলকেই বিলক্ষণ কৃতার্থ করিয়াছিলেন। পথে ভাই শশীভূষণ মল্লিক পীড়িত অবস্থায় আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন ও কয়েক দিন একত্রে ছিলেন।

মাঘ মাসে কলিকাতা যাইয়া উৎসব সম্ভোগ করি। উৎসবান্তে শরীর সারিবার জন্য জামতাড়া যাই। বাবু শশীভূষণ সরকার এখানকার ডাক্তার। তাঁহারই বাড়ীতে প্রায় ১৬।১৭ দিন থাকি। একাকী পাহাড়ে, মাঠে ও বনে বনে বেড়াইতাম। শশী বাবুর পরিবারে মাঝে মাঝে উপাসনা করিয়াছি। একদিন নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে কতকগুলি কৃষিজীবি লোকের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করি। স্ত্রীলোক পুরুষে, কয়েকটী লোক সেখানে মিলিত হইয়াছিল। পরিশেষে সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিয়া তাহাদের নিকট বিদায় হই। আরো তাহাদের সেখানে যাইবার জন্য তাহারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল।

স্মৃতি পুস্তক ১১ই ফাল্গুন—আজ কয়েক দিন মনটা ভাল নাই। প্রাতঃকালে জামতাড়ার উত্তরদিকস্থ একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ে চলিয়া

গেলাম। যাইবার ইচ্ছা ছিল না। প্রভু স্বয়ং আমাকে লইয়া গেলেন। একটী বৃহৎ শীলার নিম্নভাগে ক্ষুদ্র গুহাতে উপবিষ্ট হইলাম। সম্মুখে বিস্তীর্ণ শালবন, মাঝে মাঝে সমতলক্ষেত্র ও শৈল-স্তুপ নয়ন গোচর হয়। দুচারিটী পাখীর সুমিষ্ট স্বরও শ্রুতিগোচর হইতেছিল। বেলা প্রায় ৯টা, সূর্য্যকিরণ উত্তপ্ত হইতেছে, আমার চিদাকাশ তদপেক্ষাও প্রতপ্ত। ভগবান তাপিতপ্রাণে প্রকাশিত হইয়া কৃতার্থ করিলেন, মনের অনেক সঞ্চিত দুঃখভার হরণ করিলেন; অনেক জীবনপ্রদ কথা বলিয়া ধন্য করিলেন।

জামতাড়া হইতে দেওঘর বৈদ্যনাথ যাই। হেডমাষ্টার যোগেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করি। মধ্যাহ্নে উপাসনা একত্রে করা গেল। প্রাচীন ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু মহাশয় উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া নানা বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সেখান হইতে ভাগলপুর যাই। শ্রদ্ধেয় প্রিয় বন্ধু হরিসুন্দর বাবুর সঙ্গে উপাসনা করিয়া ভারি তৃপ্ত হই। তিনিও আমাকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমি কখনও অধিক কাল বাস করি নাই, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁর প্রতি আমার এবং আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ ভালবাসা অনুভব করিয়া থাকি।

তথা হইতে রামপুরহাট হইয়া বোলপুর শান্তি-নিকেতনে যাই। শান্তি-নিকেতনে সজন নির্জ্জন উপাসনা প্রসঙ্গাদিতে দুই দিন কাটান যায়। তৎপর কলিকাতা হইয়া চুয়াডাঙ্গা আসি। সেখানে একদিন মিঃ কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে উপাসনা ও প্রসঙ্গাদি হয়। তৎপর ঢাকা চলিয়া আসি।

বাড়ীতে স্ত্রী আসন্ন প্রসবা। তাঁহার মনে চিন্তা হইয়াছিল, আমার অনুপস্থিতিতে সন্তান হইলে ভারি ক্লেশে পড়িবেন। কিন্তু ভগবান তাহার পূর্ব্বেই আমাকে লইয়া আসিলেন। স্ত্রী খুব আহ্লাদিত হইলেন।

১৮১৪ শকের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে উপাচার্য্য মহাশয়, দুর্গানাথ রায় ও আমি কাকিনা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, নীলফামারি, জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ী, দেবীগঞ্জ, সৌদপুর, পার্ব্বতীপুর, ফুলবাড়ী, নওগাঁ এবং দিঘাপাতীয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচার করি। শেষোক্ত স্থানে আসিয়া আমার ভয়ানক দাস্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়ি। উপরোল্লোখিত বন্ধুরা আমাকে তথায় রাখিয়া ঢাকায় চলিয়া আসেন। আমি একটু ভাল হইয়া আসি। শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় আমাকে বিলক্ষণ যত্ন করিয়াছিলেন।

ঢাকা আসিবার কয়েক দিন পরে বিধানপল্লীতে ব্রাহ্মিকা সমাজ পুনরায় আরম্ভ হয়। সপ্তাহে একদিন উপাসনা ও একদিন আলোচনা হয়। মেয়েদের বিশেষ অনুরোধে উপাসনা ও আলোচনার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল।

যুবকদের ধর্ম্মনীতি শিক্ষা সভার কার্য্যও বহু বৎসর আমার উপর ন্যস্ত ছিল। ৺রমণীকান্তের আগ্রহে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ উপাচার্য্য মহাশয়ই আলোচনার কার্য্য করিতেন, তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে আমি কাজ করিতাম। পরে অনেক বৎসর আমার উপর সম্যক কার্য্যভার অর্পিত ছিল।

স্ত্রী বিয়োগের অব্যবহিত পরেই ঢাকা নববিধান সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব। উৎসবের পূর্ব্বে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

শিশুসন্তানদিগকে লইয়া বড় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। দাসের ভরসা এক গোসাঞী, তাঁরই শরণ লইলাম। দুর্গাদাস বাবুর পুত্রবধূ শ্রীমতী কুমুদিনী কয়েক দিন অমিয়াকে রাখিলেন। পরে শ্রীমতী হরবালা দেবী তাহার প্রতিপালনের ভার লইলেন। কলিকাতায় প্রচারক পরিবারের প্রতিপালক শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় দুইটী কন্যার ভার গ্রহণ করিলেন। শ্রীনাথ বাবু একটীকে লইয়া গেলেন। প্রভু এইরূপে দাসকে

নির্ম্মুক্ত করিলেন। সুখদার পরলোকান্তে এক মাসের কিছু অধিক ঢাকায় ছিলাম। তৎপর প্রেমলতা ও যোগিনীবালাকে লইয়া কলিকাতা যাই। প্রায় এক মাসকাল কলিকাতায় প্রেরিত মণ্ডলীর সঙ্গে বাস করিয়া অন্তরে অনেক শান্তি, আরাম ও শুদ্ধতা লাভ করিলাম। তৎপর শরীর সারিবার জন্য আরা নগরে শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তের বাড়ী মাসাধিক কাল বাস করি। গঙ্গাবাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আমাকে বিশেষ আদর যত্ন করিয়াছিলেন। প্রেরিত ভাই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় তথায় ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একত্রে উপাসনা প্রসঙ্গাদি করিয়াও বিলক্ষণ উপকৃত হইলাম। মধ্যে মধ্যে কোনও কোনও বাড়ীতে উপাসনা প্রসঙ্গাদিও করিয়াছি।

তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া মাঘোৎসব সম্ভোগ করি। হরবালা দেবী অসুস্থতা নিবন্ধন অমিয়াকে রাখিতে অক্ষম হন। কিছু দিন শ্রীযুক্ত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্ত্রী তাহাকে রাখেন। আমি উৎসবান্তে ঢাকা যাই। তখন হইতে অমিয়া আমার নিকট থাকে।

২৩শে মাঘ ঢাকায় আসি। ষ্টীমারে একটী পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু বাবু প্যারীমোহন দাসগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পরলোক তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে প্রসঙ্গ হয়। বিধানপল্লীতে পদার্পণ করিবামাত্র পল্লীর বালক বালিকারা অতিশয় প্রীতির সহিত আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। এক দিকে শূন্য গৃহের দিকে তাকাইয়া শোক, আর এক দিকে প্রিয়দর্শন বালক বালিকাগণের প্রেমের মিষ্ট ব্যবহারে প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল। তন্মধ্যে হরি-প্রেম-রস আস্বাদ করিলাম। ঘরবাড়ী যেমন ছিল, তেমনই সকল পড়িয়া আছে, নাই পৃথিবীতে কেবল সেই প্রেমে গড়া মূর্ত্তিখানি! বৃক্ষ লতা তৃণ সকলই যেন শোকের বসন পরিধান করিয়াছে। সমাধিস্তম্ভ দুটী পরলোকের পানে পথ দেখাইয়া দিতেছে। তাহাদের ইঙ্গিতে সেই লোকেই প্রবেশ করিলাম। উত্তমাঙ্গ যেখানে, প্রাণ

স্বভাবতঃ সেইখানে ছুটিয়া যাইতে চায়। পরম মাতার প্রেম-বক্ষে তাঁহার কন্যা বিরাজিত। স্মৃতি পুস্তক ২৮শে মাঘ—রাত্রিতে অনঙ্গ বাবুর বাসায় উপাসনা ও আহার করি। ঈশ্বর দর্শন বিষয়ে প্রসঙ্গ হইল। বাড়ী আসিয়া গৃহে শয়ন করিলাম। অন্তরে মায়াময় ভাব যোগ উপস্থিত হইল। বলিলাম এখন আর মায়া জনিত ভাব যোগে কি প্রয়োজন? আত্মা পরমাত্মাতে বাস করিতেছেন পরমাত্মা যোগে আত্মার সঙ্গে মিলন দর্শন হইল।

২রা ফাল্গুন ভাই দুর্গানাথের প্রিয়তমা কন্যা সুকুমারী "মা, মা" বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করেন। শব বিদায় কালে প্রার্থনা করিলাম। ব্রহ্মমন্দিরে আমাকেই উপাসনা করিতে হইল। আত্মার অমরত্ব বিষয়ে অতি তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ হইল।

মাসাধিক কাল অমিয়াকে লইয়া থাকি। আমাশয় পীড়ায় অমিয়া বড় কাতর হইয়াছিল। আমার আর রাত্রিতে ঘুম হইত না। বার বার উঠিয়া তাহার মল পরিষ্কার করিতে হইত।

১৭ই চৈত্র অমিয়াকে লইয়া ময়মনসিংহ গমন করি। প্রায় ছয়মাস পরে প্রাণাধিকা কন্যা প্রীতিলতা আমাদিগকে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। শ্রীনাথবাবু, বামা ও সন্তানগণ সকলেই সাদরে গ্রহণ করিলেন। সায়ংকালে তাঁহাদের বাড়ীতে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইল। ভাই দীননাথ কর্ম্মকার ময়মনসিংহে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে উপাসনা, প্রার্থনা ও প্রসঙ্গে অনেকদিন বেশ কাটিতে লাগিল। অমিয়াকে লইয়া বড় ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। ১৮২০ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে অমিয়াকে বামার নিকট রাখিয়া আমি পুনরায় ঢাকা যাই। ধর্ম্মবন্ধু দিগের সঙ্গে কয়েকদিন বাস করিয়া নববল লাভ করিবার অভিপ্রায়ে প্রভুর ইঙ্গিতে এবার ঢাকা আসি। কয়েকদিন তথায় থাকিয়া উপাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে কাওরাইদ যাই। এখানে প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত

কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের কাছারী বাড়ী। উপাসনা আমোদ প্রমোদে তিনদিন সেখানে থাকিয়া পুনরায় ঢাকা যাই। ঢাকায় কয়েক দিন থাকিয়া আবার ময়মনসিংহ আসি। এযাত্রায় প্রতিদিন প্রাতে শ্রীনাথ বাবুর বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা হইল।

স্মৃতিপুস্তক—৩রা শ্রাবণ—অমিয়াকে লইয়া এক প্রকার বন্দী হইয়াছিলাম। ভাই চন্দ্রমোহন মোকামা হইতে লিখিলেন, অপূর্ব্ব বাবুর স্ত্রী অমিয়াকে রাখিতে প্রস্তুত। শুনিয়া প্রভুর চরণে কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণাম করিলাম।

৪ঠা শ্রাবণ—ছাতার অভাব ছিল। প্রভু শ্রীমান বিহারীর সহযোগে একটি ছাতা দান করিলেন। স্বয়ং ছাতা লইয়া অবতীর্ণ হইয়া দাসকে আচ্ছাদন করিলেন; ছাতার আচ্ছাদনে তাঁহারই আবির্ভাবের আচ্ছা-দন দেখাইয়া কৃতার্থ করিলেন। ইনি এক মজার ঠাকুর! সামান্য বিষয় ধরিয়া দাসের নিকট প্রকাশিত হইতে ব্যস্ত।

১১ই ভাদ্র শ্রীমতী সুখদাসুন্দরীর বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন। প্রাতঃকাল হইতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। যাঁহাদের একান্ত প্রাণের টান আছে এমন গুটিকয়েক বন্ধু উপস্থিত হইলেন। পবিত্রভাবে স্নানা-বগাহন করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলাম। প্রেমময়ী মা তাঁহার বক্ষস্থ অশরীরি ও শরীরি আত্মালোকসহ প্রকাশিত হইয়া আরাধনার পীযূষ পান করিতে দিলেন। তিনি সমস্ত লোকের প্রাণ, সেই প্রাণে সকলের সঙ্গে এক প্রাণী হইয়া আছি, ইহা অতি সুন্দরমত প্রকাশ হইয়াছিল। সুখদা আত্মার সঙ্গে প্রাণরূপী ভগবানের বক্ষে আমার কতদূর একত্ব লাভ হইয়াছে, আমার আত্মার গঠনে কতদূর তিনি আর কতদূর আমি ইহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন কে আর পরিমাণ করিতে পারে? সেই মিলন চির উন্নত হউক। প্রিয়জনেরা যে লোকে চলিয়া যাইতেছেন, বাকী জীবন যেন সেই লোকের

জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। ভাই দীননাথ ও শ্রীনাথ বাবুও প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ঢাকার সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগ দিবার জন্য ১৬ই ভাদ্র প্রীতি ও অমিয়াকে লইয়া ঢাকাতে আসি। অমিয়াকে কাহারো নিকট না রাখিতে পারিলে উৎসবে ভালরূপে যোগ দেওয়া অসাধ্য। ঈশ্বরের কৌশলে শ্রীমতী হরবালা দেবী পুনরায় অমিয়ার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে সম্মতা হন। তখন হইতে প্রায় দশ বৎসর অমিয়া তাঁর কাছে যত্ন ও আদরে প্রতিপালিত হয়। এই জন্য তিনি আমার চির কৃতজ্ঞতাভাজন।

উৎসবান্তে প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে প্রচার যাত্রায় বাহির হই। ৮ই আশ্বিন ভাই দীননাথ কর্ম্মকার, চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার, মহিমচন্দ্র সেন ও আমি নৌকাযোগে যাত্রা করি। ক্ষুদ্র নৌকাখানি নববিধানের পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। সঙ্গে খোল, করতাল, একতন্ত্রী, ও হারমন ফ্লুট বাদ্যযন্ত্র ছিল। নৌকায় আরোহণ করিয়াই প্রার্থনা করা হইল। ভাই দুর্গানাথ আমাদিগকে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া গেলেন।

পরদিন সকাল বেলা নৌকায় উপাসনা হইল। যাত্রাতে যাহাতে পরম প্রভুর সম্যক জয় হয়; আমরা তাঁহার পাছে পাছে ফিরিয়া ব্যবহৃত হইতে পারি এই জন্য প্রার্থনা হয়। ক্রমে ফুলবাড়ী, সাভার, রোয়াইল, রঘুনাথপুর, নবগ্রাম, নান্নার, সুয়াপুর, আমতা, কেদারপুর, নাগরপুর, এলাসীন, অলোয়া, টাঙ্গাইল, বাঘিল, বীরসিংহ ও তিল্লিতে উপাসনা, বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন ও প্রসঙ্গ দ্বারা প্রভুর জয় ঘোষিত হয়। গ্রাম্য লোকেরা অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার নাম শুনিয়াছে। অনেক গোঁড়া হিন্দুর গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। এক গ্রামে লোকে বলিতেছিল যে এতদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম সহরেই ছিল, এখন দেখি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। প্রায় তিন সপ্তাহের অধিককাল অক্লান্ত

পরিশ্রম করিয়া আমরা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। তৎপর একমাস কাল ঢাকায় থাকিয়া ধুবরী ত্রৈলোক্য বাবুর কন্যার বিবাহে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া যাই। সেখানে পরিবারে পরিবারে ও মন্দিরে উপাসনাদি কার্য্য করি। একদিন বিলাসীপাড়া যাইয়া মহেন্দ্র বাবুর পরিবারে উপাসনা করিয়াছিলাম।

১৮২০ শকের মাঘ মাসের শেষভাগে ভাই ফকিরদাস রায় চলিয়া আসাতে আমি শ্রীদরবার কর্ত্তৃক কুচবিহার সমাজের আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রেরিত হই। ফাল্গুন চৈত্র মাস সেখানে থাকিয়া কাজ করি। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল সেখানে গমন করিলে আমি চলিয়া আসি। তখন কুচবিহার সমাজ কলিকাতার দলাদলির গোলমালে প্রভাবান্বিত।

১৮২১ শকের বৈশাখ মাসে দার্জ্জিলিং যাই। সেখানে প্রায় এক-মাস কাল অবস্থিতি করি। কয়েক রবিবার স্থানীয় বন্ধুদের অনুরোধে দার্জ্জিলিং ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করি। পাহাড়ের নির্জ্জন প্রদেশে নানাস্থানে উপাসনা ধ্যান করা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাহাড় হইতে নামিবার সময় খর্সং নামক স্থানে ভক্তিভাজন প্রতাপবাবু মহাশয়ের শৈলাশ্রমে দুইদিন উপাসনা প্রসঙ্গ করিয়া সুখী হই। তথা হইতে জলপাইগুড়ি, ফুলবাড়ী, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে কিছু কিছু প্রচার কার্য্য করিয়া আষাঢ় মাসে কলিকাতা উপনীত হই।

ইহার কিছু দিন পর প্রেমলতা ও যোগিনীকে লইয়া কিছু দিন ঢাকায় থাকি। কিন্তু নানা রূপ অসুবিধা বশতঃ আর বেশী দিন সেখানে থাকিতে না পারিয়া পুনরায় কলিকাতা আসি।

শ্রাবণ মাসে রাঁচির অন্তর্গত গেতলসুদ চা-বাগানের ম্যানেজার বাবু রামচরণ পালের মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গমন করি। গেতলসুদ ও রাঁচিতে কয়েক দিন উপাসনা প্রসঙ্গাদি হয়। পথে পুরুলিয়াতে

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু প্রসন্নকুমার দাস গুপ্তের গৃহে উপাসনাদি হইয়াছিল। তথা হইতে কলিকাতা আসি।

ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে ও আশ্বিন মাসে পুনরায় ঢাকা, ময়মনসিংহ ও জামালপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচার করা হয়।

কার্ত্তিক মাস হইতে কলিকাতা বাস। একবার বড় দিনের ছুটীতে আশুতোষ রায় সহ ধশা গ্রামের উৎসবে যাওয়া যায়। সেখানে কয়েক দিন উপাসনা বক্তৃতা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বেশ অতিবাহিত হয়।

১৮২১ শকের মাঘোৎসবে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মিলনের জন্য বিশেষ যত্ন হয়। প্রায় ষোল বৎসর পর সকলে মিলিয়া ব্রহ্মমন্দিরে আরতি হয়।

ফাল্গুন চৈত্র মাস ঢাকা, চট্টগ্রাম, শিলচর, ও বর্ণারপুর প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত হয়। চৈত্র মাসের শেষ ভাগে কলিকাতা আসিয়া এক সপ্তাহ অবিরাম জ্বরে শরীর বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। একটু সারিয়া শ্রীমান যোগেন্দ্রের সঙ্গে মেয়েদের তিনজনকে লইয়া পৈতৃক গৃহ বীরসিংহ গ্রামে যাই। সেখানে মাতৃদেবীর যত্নে ও শুশ্রূষায় শরীর সবল হয়। প্রায় দু'মাস বাড়ী থাকিয়া জামালপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে কিছু কিছু প্রচার কার্য্য করিয়া আষাঢ় মাসে কলিকাতা ফিরি। ১৮২২ শকের আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া দু'মাসের জন্য কুচবিহার যাই। দু'মাসের জন্য যাইয়া সেখানে তিন বৎসর থাকিতে বাধ্য হই। কুচবিহারে প্রতি রবিবার সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, প্রাতে জেলখানায় কয়েদীদিগকে উপদেশ ও সঙ্গীত শুনান হইত। বাড়ী বাড়ী উপাসনা, প্রসঙ্গাদি করা যাইত। সময় সময় মফঃস্বলে প্রচার করা হইত। মফঃস্বলে প্রচার, প্রান্তরে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন, ভদ্রলোকদের জন্য প্রকাশ্যে বক্তৃতা, ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়ে নীতি উপদেশ, নানা জনের গৃহে প্রসঙ্গ, উপাসনা, প্রার্থনা, সঙ্গীতাদি

করা হইত। এইবার অগ্রহায়ণ মাসে বড় ভাগিনেয়ী শ্রীমতী শান্তির বিবাহ উপলক্ষে ময়মনসিংহ যাইতে হইয়াছিল।

১০ই মাঘ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণের সংবাদ পাই। কয়েক দিন এই নারীরত্নের জীবনকাহিনী মন্দিরে ও অন্যত্র আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।

কুচবিহার জেলের কয়েদীদিগকে যখন উপদেশ দিতাম, অনেকের সঙ্গে কথা কহিয়া তাহাদের অবস্থা জানিতে যত্ন করিতাম। বিপিন নামে একটী যুবক অপকর্ম্ম করিয়া তিন বৎসরের জন্য জেলে আসিয়াছিল। তার সংসারে আপনার বলিবার কেহ ছিল না। তাহার কারামুক্তির পর পাব্লিক ওয়ার্কের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু কেদারনাথ মজুমদারের সহযোগে তাহাকে ওয়ার্কশপে সূতার মিস্ত্রীর কাজ শিখান হয়। শুনিয়াছি পরবর্ত্তী জীবনে সে একজন ভাল মিস্ত্রী হইয়া সাধুভাবে জীবন যাপন করিতেছে।

১৮২২ শকের প্রথম ভাগে মেয়েদের চারিজনকে কিছু দিনের জন্য কুচবিহার লইয়া যাই। তাহারা প্রায় তিন মাস কাল আমার কাছে বড় আনন্দে কাটাইয়াছিল। তাহাদের মাতৃ বিয়োগের পর আর এত দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে থাকিতে সুযোগ পায় নাই।

এই বৎসর একবার মাথাভাঙ্গা অঞ্চলে প্রচার করিতে যাই। মাথাভাঙ্গায় কয়েকদিন উপাসনা, কীর্ত্তন, বক্তৃতাদি হয়। তথা হইতে তিন চারি মাইল দূরবর্ত্তী শীকারপুর গ্রামে যাই। গ্রামের প্রধান লোকদের নিকট নববিধান প্রচারের প্রস্তাব করাতে কেহই তদ্বিষয়ে সহানুভূতি করিতে পারেন নাই। সেখানে তাঁহারা কিছু করিতে দিবেন না এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে সেখানে সায়ংকালে গ্রামে খবর দিয়া এক বাড়ীর বৈঠক খানায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। জন কতক বয়স্ক লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রার্থনা,

উপদেশ, কীর্ত্তন ও প্রসঙ্গে অনেক রাত্রি কাটিয়া গেল। তখন তাঁহাদের নিকট প্রসঙ্গ, কীর্ত্তনাদি এত ভাল লাগিয়াছে যে আর ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না; বিদায় হইবার সময় বারবার অনুরোধ করিলেন, আবার মাথাভাঙ্গা আসিলে যেন তাঁদের গ্রামে আসা হয়। ভগবানের লীলা দেখিয়া অবাক হইলাম।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কুচবিহার ত্যাগ করি। এই সময় কুচবিহারে তিন বৎসরের জন্য এক একজন প্রচারককে রাখিয়া কাজ করান হইবে এইরূপ নিয়ম করা হয়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রেমলতার সঙ্গে চট্টগ্রাম নিবাসী পালামৌর সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রভূষণের শুভবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। শৈলেন্দ্রের বয়স ২৫, প্রেমলতার বয়স ১৬। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কর্ম্ম করেন।

কলিকাতা আসিয়া আমি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মাঘোৎসবের পর ফাল্গুনমাসে আসামে প্রচার করিতে যাত্রা করি। ময়মনসিংহের প্রচারক ভাই দীননাথ কর্ম্মকারকে সঙ্গে লইয়া প্রথমতঃ শান্তিপুর যাই। সেখানে কয়েকদিন উৎসাহের সহিত প্রভুর নাম কীর্ত্তিত হয়। স্থানীয় বন্ধুদেরও বিলক্ষণ প্রমত্ততা হয়। তাঁহারা কয়েকজন রাণাঘাট পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গী হন। বাবু শরচ্চন্দ্র সিংহের গৃহে উপাসনা, প্রার্থনা, প্রান্তরে বক্তৃতা ও নগর কীর্ত্তনাদি হইল। তথা হইতে আমরা রাজবাড়ী যাই। সেখানেও উপাসনা, কীর্ত্তনাদি হয়। তৎপর ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জ গমন করি। সিরাজগঞ্জে বাবু জলধর সরকারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি। ভাই দীননাথের অসুস্থতা বশতঃ প্রায় একপক্ষ-কাল এখানে থাকিতে বাধ্য হই। প্রতিদিন বন্ধুদের গৃহে গৃহে

উপাসনা, প্রসঙ্গ, স্কুলে ও প্রান্তরে বক্তৃতা। নিকটবর্ত্তী এক গ্রামেও একদিন বক্তৃতা হইয়াছিল। এখান হইতে ধুবড়ী, সেখান হইতে গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, তেজপুর, বড়জুলী চা-বাগান, ডিব্রুগড়, ডুমডুমা চা-বাগান প্রভৃতি স্থানে প্রচার করা হয়। সমাজে ও বন্ধুদের ভবনে উপাসনা, উপদেশ, সঙ্গীত কীর্ত্তন, প্রসঙ্গ, বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা প্রায় সকল স্থানেই নববিধানের তত্ত্ব সকল প্রচারিত হইত। প্রায় তিনমাসকাল আমরা এই সকল স্থানে বাস করি। সর্ব্বত্রই লোকে বিধানতত্ত্ব ও ঈশ্বরের নাম গুণ শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ফিরিবার সময় ময়মনসিংহে ভাই দীননাথকে রাখিয়া ঢাকা হইয়া আমি কলিকাতা প্রত্যাগত হই।

১৯০৫খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ তমলুক, কাঁথি, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, কটক, পুরী প্রভৃতি স্থানে প্রায় তিন মাসকাল প্রভুর কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগত হই। কাঁথির মফঃস্বলে কয়েকটী গ্রামে সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। কোন কোন গ্রামেও উৎসব এবং উপাসনা হইল। সাবডিভিশনাল অফিসার বাবু প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত আমার প্রচার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রসন্নবাবুর আবাস বাটী একটী বালির টিলার উপর দ্বিতল গৃহ। ছাদ হইতে বঙ্গোপসাগর দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক দিন তাঁহার গৃহে উপাসনা প্রসঙ্গে, এবং তাঁহাদের আদর যত্নে বেশ কাটিয়াছিল।

বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী সিন্ধিয়া গ্রামে প্রাচীন ব্রাহ্ম পদ্মলোচন দাস মহাশয় বাস করেন। নদীতীরস্থ বৃক্ষাদি সমাচ্ছাদিত তাঁহার বাড়ীটী আমার নিকট ঋষিদের আশ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাঁহার অনুরাগদীপ্ত সঙ্গীত ও প্রার্থনাদিতে আমি বড় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। যুগ-ধর্ম্মবিধানে বিধাতা কত স্থানে কত

সাধু আত্মাকে লইয়া কত লীলা করিতেছেন দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

পুরীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ করি। তাঁর গৃহে উপাসনা করা যাইত। প্রত্যূষে ও অপরাহ্নে অনেক সময় সমুদ্রতীরে মহান প্রভুর আবির্ভাবের ভিতর ডুবিয়া কৃতার্থ হইতাম। সমুদ্রতীরে কোন কোন বন্ধুর সঙ্গেও প্রসঙ্গ হইত। তখন প্রিন্সিপ্যাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় পুরীতে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গে তৃপ্তি বোধ হইত। তাঁর বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা দেখিয়া বড় সুখী হইয়াছিলাম।

জুলাইমাসে সিরাজগঞ্জ উৎসবে যাই। তথা হইতে পিঙ্গনা, বীরসিংহ, জামালপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতা আসি।

কুচবিহার ছাড়িবার পর কয়েক বৎসর প্রচার কার্য্যালয়ের বার্ষিক হিসাব খৈতান প্রস্তুত করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। সে সকল কার্য্য সমাপন করিয়া প্রচার কার্য্যে বহির্গত হইতে দুই এক মাস গৌণ হইয়া যাইত। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বাহির হইয়া তিন চারি কি ছয় মাসও নানা স্থানে প্রচার করা যাইত। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, আগড়তলা, শিলচর, করিমগঞ্জ, জামালপুর, পিঙ্গনা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে প্রচার করা হইয়াছিল।

এ বৎসর ময়মনসিংহের কোন কোন স্থানে অন্নকষ্ট হেতু লোকের বড় ক্লেশ হইয়াছিল। গোপালপুর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষে সাহায্য দানের জন্য আমি টাঙ্গাইল হইতে গমন করি। সেখানে গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোকের গৃহে সাহায্য দান করিতাম। লোকের হতাশ প্রাণে ভগবানের দয়ার কথা বলিয়া আশ্বাস দিতে যত্ন করিতাম। কোন কোন গ্রামে

দুঃস্থদিগকে একত্র সমবেত করিয়া কিঞ্চিৎ উপদেশ দান পূর্ব্বক অর্থ বিতরণ করিতাম। ব্যবসায়ী লোককে সামান্য কিঞ্চিৎ মূলধন দিয়া ব্যবসায়টা চালাইয়া যাতে অন্নসংস্থান করিতে পারে তার উপায়ও করিতাম।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রচার কার্য্যালয়ের কাজের সহায়তা করিতাম। চুঁচুড়া ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। প্রতি শনিবার সায়ংকালে তথায় উপাসনা হইত। প্রায় দুই তিন বৎসর কাল এ উপাসনা চালাইতে হইয়াছিল। কোন দিন ২।৩ জন, কখনও ১০।১৫ জনও উপস্থিত হইতেন। উপাসনান্তে অনেক দিন রাত্রিতেই কলিকাতা আসিতাম, কোন কোন দিন লেডি ডাক্তারের গৃহে আহার করিয়া মন্দিরেই শয়ন করিতাম। রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া পৌছিতে ১১টা, ১২টা, ১টা হইয়া যাইত।

শ্রীদরবারের সম্পাদক পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এবং দরবারের সভ্যদের দরবারের বিধিপালনে শৈথিল্য দর্শন করিয়া সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। আমাকে তাঁহার স্থলে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। প্রায় ১২ বৎসর এ কার্য্য করা হয়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী টাঙ্গাইল নববিধান ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, দীননাথ কর্ম্মকার, চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার, আশুতোষ রায়, ও আমি সেখানে যাই। কয়েকদিন খুব প্রমত্তভাবে সেখানে উৎসব হয়। টাঙ্গাইলের নিকটবর্ত্তী বেড়াবুচিনা, বাঘিল, যুগিনী, বাসা, লাউজানা, দাইন্না, আলিসাকান্দা, সিহরাইল প্রভৃতি গ্রামে প্রচার করা হয়।

ইহার কিছু দিন পর গিরিধি, মিহিজাম, সীতারামপুর, ও আসান-সোল প্রভৃতি স্থানে যাই।

মে মাসে বনমালীচট্টা ও কাঁথি প্রভৃতি স্থানে যাই। অক্টোবর

নবেম্বরে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকি। জানুয়ারী মাসে উপাধ্যায় মহাশয় "ধর্ম্মতত্ত্বে"র সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করেন। শ্রীদরবার কর্ত্তৃক আমার উপর কার্য্যভার অর্পিত হয়। আমি অযোগ্য লোক বলিয়া উক্ত কার্য্যগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সকলের অনুরোধে ও উপাধ্যায় মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে প্রভুর কার্য্য বলিয়া আমি এভার গ্রহণ করি। প্রায় প্রতি পক্ষেই বিধাতার চরণে বিশেষ-ভাবে শরণাপন্ন হইয়া আমি প্রবন্ধাদি লিখিতে যত্ন করিতাম। বিদ্যাবত্ত্বা মাত্র নাই দেখিয়া আমি দীন ভিখারী বেশে প্রভুর চরণে উপবিষ্ট হইয়া লেখনী পরিচালন করিতাম, এবং সময় সময় এমন সকল লেখা বাহির হইত, যাহা পাঠ করিয়া আমিই আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম। উপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ধর্ম্মগুরু ও বন্ধুগণও বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। বাঙ্গালা ১৩১৭ সালের ও ১৮৩১ শকের ১লা মাঘ হইতে "ধর্ম্মতত্ত্বে"র ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। প্রায় দশ বৎসরকাল সম্পাদকীয় কার্য্যভার আমার হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রার্থনাটী শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র হইতে আদায় করিতে যত্ন করিতাম। প্রথম প্রথম তিনি লিখিতে বড়ই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে বিলক্ষণ নিষ্ঠার সহিত প্রার্থনা লিখিতেন। প্রার্থনা পাঠে অনেকে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। সংবাদস্তম্ভেও তাঁহার অনেক লেখা থাকিত। ঢাকার ভাই ঈশানচন্দ্র সেন ও টাঙ্গাইলের শশিভূষণ তালুকদার এ কয় বৎসর লেখা দ্বারা বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। আরো অনেক বন্ধু অনেক সময় লেখা দ্বারা মণ্ডলীর সেবায় সহায়তা করিয়াছেন। "ধর্ম্মতত্ত্ব" পরিচালনে আমার একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল যে নববিধান মণ্ডলীর পরস্পর বিচ্ছেদ বৃদ্ধি না পাইয়া যাহাতে মণ্ডলীর মধ্যে মিলন সমাগত হয়। নিরপেক্ষভাব রক্ষা করিতে যাইয়া সময়

সময় পরীক্ষাতে পড়িতে হইয়াছে। বিধাতার কৃপায় সে মেঘ কাটিয়া যাইত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালীতে পূর্ব্ববাঙ্গালা নববিধান-বিশ্বাসী সমিতির অধিবেশন হয়। আমাকে সভাপতির কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এবার সমিতি উৎসবের আকার ধারণ করে।

আমার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী যোগিনীবালা কলিকাতা ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িতেন। তখন এ বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল না। যোগিনী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার জন্য বড় আগ্রহান্বিত হইলেন। কলিকাতায় তাহার সুযোগ অভাব দেখিয়া ময়মনসিংহ যাইতে ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু এ বিষয়ে অভিভাবক কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সম্মতি না পাওয়াতে কিছু সঙ্কটে পড়া গেল। যোগিনী বারবার আমার কাছে আব্দার করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনিচ্ছায় কান্তিবাবু আমার উপরে ভার দিলেন। ময়মনসিংহ বালিকা বিদ্যালয়ে একটি বে-সরকারী বৃত্তি পাইয়া দুই বৎসর পাঠান্তে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা আসিলেন। কান্তিবাবু তাহাকে পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার প্রথম বিভাগে পাশের সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যথেষ্ট আদর ও স্নেহ জানাইলেন। ইহার দুই চারিদিন পরেই অপ্রত্যাশিত ভাবে পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধের প্রস্তাব হয়। একদিন কান্তিবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মেজ মেয়েকে রাখিয়া তৃতীয়া কন্যা যোগিনীকে বিবাহ দিতে কোন আপত্তি আছে কি না ?" আমি বলিলাম, "বিধাতা যখন যাহার জন্য বর জুটাইয়া দিবেন, তখন তাহার বিবাহ দিতে আমার কোন আপত্তি নাই।" ইহার পরদিন ছেলেমেয়ের দেখা হইয়া উভয়ের সম্মতি হইল। তিন চারিদিনের মধ্যে পাকা দেখা হইয়া গেল। তাহার এক মাসের মধ্যে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

১৯১১ এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দের অনেক সময় কলিকাতায় থাকি, কয়েক মাস গৃহনির্ম্মাণ উপলক্ষে ঢাকায় বাস করি। দেওঘরে শ্রীমান মনোরথের বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করি। ঢাকার অন্তর্গত বেজগাঁয়ে বাবু প্রসন্নকুমার দাস গুপ্তের ভবনে উৎসব উপলক্ষে উপাসনাদি করা হয়। কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহে কখন মন্দিরে, কখন বন্ধুদের গৃহে উপাসনাদি করা হইয়াছে। বাঁকিপুর, আরা, ছাপরা, গয়া, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচার করা হয়। ডিসেম্বর মাসে বাঁকিপুর থীষ্টিক কন্‌ফারেন্সে যোগ দি। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সেখানেই বসন্ত পীড়াগ্রস্ত হই। যোগিনী, জামাতা ও শ্রীমান অক্ষয়কুমার বিলক্ষণ সেবা করেন। যন্ত্রণাদায়ক পীড়ার অবস্থায় দয়াময় নাম জপ ও উচ্চারণে অনেক আরাম পাওয়া গিয়াছে। বাঁকিপুর হইতে গিরিধি আগমন করি। উপকারী বন্ধু বাবু অমৃতলাল ঘোষের সেবা ও যত্নে শরীর অনেক সবল হয়। গিরিধিতে প্রতিদিন প্রাতে উপাসনা ও সায়ংকালে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হইত।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে কাটান হয়। এবার চট্টগ্রামে কন্‌ফারেন্স হয়। বেশ জমাট সমিতি হইয়াছিল। এখানেই পূর্ব্ববাঙ্গালা নববিধান-বিশ্বাসী সমিতির পরিবর্ত্তে ইহার নববিধান-বিশ্বাসী সমিতি নাম প্রদত্ত হয়।

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র" গ্রন্থের অন্ত্য বিবরণে "কেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব স্বীকার" বিষয়ে যে সকল ইংরেজী কাগজের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমাকে অনুবাদ করিয়া দিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালা কাগজের অভিমতও আমার দ্বারা সংগৃহীত।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দ নববিধান মণ্ডলীর পক্ষে এক বিশেষ সময়। এই বর্ষে বিচ্ছিন্ন মণ্ডলীর পুনর্মিলন সংঘটিত হয়। ভাদ্রোৎসবটী সম্মিলিত

ভাবে সম্পন্ন হয়। ১৯১৪ সালের মাঘোৎসব আরো জমাট হয়। এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌ নগরে নববিধান সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন হয়। এখানে নানা স্থানের বিশ্বাসিমণ্ডলী সমবেত হন। মহারাণী সুনীতি দেবী সভাপতির কার্য্য করেন। বিধাতার কৃপা অজস্র বর্ষিত হইয়া নরনারীর হৃদয়ে এক মহা প্রেমের বন্যা বহিয়া গেল। নববিধান মণ্ডলীর মধ্যে নবজীবন সঞ্চারিত হইল। আমি সেখানে এক মাস পূর্ব্বে আহূত হইয়া যাই এবং সঙ্ঘের পরও প্রায় এক মাস কাল থাকিয়া সেখানে কার্য্য করি।

যোগিনীর বিবাহের প্রায় আড়াই বৎসর পরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর বাঁকিপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান নবজীবনের সঙ্গে আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রীতিলতার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। বিধাতার কৃপায় এ সম্বন্ধও অনায়াসে ধার্য্য হইয়াছিল। এই বৎসর পূজার ছুটীর সময়ে আমি প্রীতি ও অমিয়াকে লইয়া গিরিধি গিয়াছিলাম। কামাখ্যাবাবুও সেই সময়ে সপরিবারে গিরিধি আসিয়াছিলেন। একদিন রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি নাকি নবজীবনকে বিবাহ করাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ?" তিনি বলিলেন, "উপযুক্ত কন্যা পাইলে বিবাহ দিতে চাই।" তখন আমি আমার কন্যার বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত করি। তিনি তাঁহার পরিবার ও পুত্রদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সম্মতি দান করেন ও দুই তিন দিনের মধ্যে পাকা দেখা সাক্ষাৎ হইয়া যায়। তাহার পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার সময় হইতে বিধাতা কৃপা করিয়া বহু ভগবদ্‌ভক্ত সাধু বন্ধু ও ভ্রাতৃরত্ন দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গ সহবাস ও দৃষ্টান্তে ধর্ম্মজীবন বিকসিত হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ ভাই বঙ্গচন্দ্র

ও তাঁহার দলকে প্রগাঢ় স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহার প্রার্থনা ও লিপিকাতে প্রকাশিত আছে। এ দীনজন সেই দলের এক হীন অঙ্গ। প্রেরিত প্রচারক মণ্ডলীর প্রায় সকলেই আমায় বিশেষ স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন। ইহা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

করুণা স্বীকার।

কৃপাময়ী পরম জননি, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে সৃজন করিয়াছ, কৃপা-পক্ষ-পুটে আবৃত করিয়া প্রতিপালন করিতেছ, জীবনের আগা গোড়া সমস্তই তোমার করুণার দান। দেহ আত্মা তোমার করুণার দান। শৈশবে স্নেহময়ী মাতা ও স্নেহময় পিতা দিয়াছিলে তুমি, পিতা মাতার বক্ষে স্নেহ রস সঞ্চার করেছ তুমি। বাল্যে তুমি বাল্য-সহচরদের সঙ্গে কত আমোদ আহ্লাদ দান করেছ। প্রথম যৌবনেই ধর্ম্মরত্ন দিয়া কৃতার্থ করেছ। আমি তোমাকে চাই নাই, অন্বেষণ করি নাই; তুমি আমাকে চেয়েছ, কৃপা গুণে আমার কাছে ধরা দিয়েছ। আমি তোমার সঙ্গে থাকিতে চাই নাই, তুমি জন্মাবধি আমার সঙ্গে রয়েছ। তুমি ধর্ম্মমণ্ডলী সৃজন করিয়া কৃপা করে সেই মণ্ডলীতে স্থান দিয়েছ। তুমি করুণা গুণে ধর্ম্মাত্মা গিরিশচন্দ্রকে আমার শিক্ষাগুরু নিয়োগ করিয়াছিলে। ময়মনসিংহে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলে আমার জন্য। গিরিশচন্দ্র, গোপীকৃষ্ণ, কালীকুমার প্রভৃতি ধর্ম্মপিপাসু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের এবং শ্রীনাথ প্রভৃতি যুবক বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত করিয়া ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলে। সাধু অঘোরনাথের মূর্ত্তিমান যোগের জীবন প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মদর্শন শ্রবণের জন্য তুমিই আমার প্রাণকে আকুল করিয়াছিলে এবং নির্জ্জনে সঙ্গোপনে তুমিই সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছ। দয়াল প্রভু, তুমি কৃপা করিয়া তোমার দাসত্বে আহ্বান করেছিলে এবং তোমার দাস বিশ্বাসী বঙ্গচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, দুর্গানাথ, বিহারীলাল, মহিমচন্দ্র প্রভৃতির

সঙ্গে মিলিত করিয়াছিলে। নববিধানের নূতন সুমিষ্ট সমন্বয়ের ধর্ম্ম তুমি কৃপা করিয়া শ্রীকেশব চরিত্রে মূর্ত্তিমান করিয়া আমাদিগকে দান করিয়াছ। শ্রীকেশবচন্দ্র ও প্রেরিত মণ্ডলীর পদপ্রান্তে তুমি স্থান দিয়া কৃতার্থ করিয়াছ। গৌরগোবিন্দ, কান্তিচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গ তোমার কৃপার বিশেষ দান। নববিধানের নূতন দৃষ্টি দান করিয়া অন্তর বাহিরে এক মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছ। ব্রহ্মময় হরিময় বিশ্ব সমক্ষে ধরিয়াছ। ধর্ম্মে ধর্ম্মে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, ধর্ম্মে জ্ঞানে, সংসারে ধর্ম্মে, জাতিতে জাতিতে, নরনারীতে, ধনী ও শ্রমিকে যে মহা বিরোধ ছিল, তাহা নিরসন করিয়া সর্ব্বত্র তুমি মহামিলন প্রতিষ্ঠার ভূমি প্রদর্শন করিয়াছ। তোমার অপার করুণা গুণে আমরা এই মহা মিলনের ধর্ম্ম পেয়েছি। ইহাতে স্বর্গ মর্ত্ত্যের মিলন, ইহ পরলোকের মিলন সাধিত হইয়াছে। তুমি তোমার সমগ্র মানব পরিবার ও বিশ্ব-জগৎ লইয়া আমার সেবাতে নিযুক্ত রহিয়াছ, নববিধানের দৃষ্টিতে ইহা যখন দর্শন করি, তখন বিস্মিত হইয়া বলি, এ ক্ষুদ্র কীটের প্রতি কেন তোমার এত করুণা! আজ জীবনের অন্ত ভাগে তোমার প্রেরিত সকল হিতকারী বন্ধুদিগকে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণাম করি। হে বিশ্বনাথ, করুণার সাগর পিতা, তোমার অশেষ প্রসাদ সম্ভোগ করিয়া কত কৃতার্থ হইয়াছি, আজ জীবনের শেষভাগে তোমার করুণা স্বীকারপূর্ব্বক তোমার পদে অবলুণ্ঠিত হই, কৃতজ্ঞতাভরে কোটী কোটী বার ও চরণে প্রণাম করি।

অপরাধ স্বীকার।

হে পতিতপাবন পরমেশ্বর, বাল্যাবধি এই বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তোমার চরণে বহু অপরাধ করিয়াছি। অজ্ঞানকৃত অপরাধের কথা বলি না, সজ্ঞানে যে অপরাধ করিয়াছি, অন্তরে তোমার বাণী শুনিয়াও তাহার

অন্যথা আচরণ করিয়াছি, সেই সকল পাপ তোমার নিকট স্বীকার করি। অবিশ্বাস সংশয় ও অবাধ্যতার শেল তোমার সুকোমল বক্ষে কতবার বিদ্ধ করিয়াছি! ষড়রিপুর বশীভূত হইয়া তোমার পুত্র কন্যাদের বক্ষে আঘাত করিয়াছি, চিত্ত কলুষিত করিয়াছি, আত্মাকে নরকের আগার করিয়া ফেলিয়াছি। তুমি কেশে ধরিয়া তুলিয়াছ, তোমার কৃপার সীমা নাই। তোমার চরণে সকল অপরাধ স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত প্রাণে তোমার চরণে শরণ লইলাম। তুমি কৃপা করিয়া পরিত্রাণ বিধান কর।

আশার কথা।

নববিধান সমাজ ও মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে এ মণ্ডলীর সম্বন্ধে অনেকে নিরাশ, তৎসঙ্গে নববিধানের পরিণাম বিষয়েও আশাহত। নববিধান মণ্ডলী বিষয়ে নিরাশ হওয়া অসম্ভব নহে, কেননা প্রথম যুগের বিধান বাহকগণের জীবন ও চরিত্র যেরূপ নীতি ও ধর্ম্মে সমুন্নত, বৈরাগ্য ও ত্যাগে পূর্ণ এবং বিধাতার প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর ছিল, আধুনিক নববিধান মণ্ডলীতে সে প্রকার পরিলক্ষিত হয়না, বরং তাহার বিপরীত ভাবেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। এখনকার মণ্ডলী অযোগ্য ও হীন হইলে তাঁহারাই এমন উচ্চধর্ম্ম পাইয়া সে ধন হারাইবেন। তদ্দ্বারা ঈশ্বরের বিধান—নববিধান—ম্লান হইবে না, হীন হইবে না, কিম্বা লোপ পাইবে না।

নববিধান বিধাতা-প্রেরিত বিধান, ইহা মানুষের সৃষ্টি নহে। এ দেশ যদি ইহা গ্রহণ না করে, অন্য দেশ গ্রহণ করিবে। নববিধান মহাসমন্বয়ের বিধান, ইহা ধর্ম্মে ধর্ম্মে, জাতিতে জাতিতে, জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে, ইহলোকে পরলোকে মিলন ঘটাইবে। তদ্ভিন্ন পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য আসিবে না। সুতরাং সকল দেশের ও জাতির কল্যাণার্থিগণ

ক্রমে নববিধানের দিকে আকৃষ্ট হইবেন। সমন্বয়ের নূতন ভাব লইয়া নূতন সমাজ ও জাতি গঠিত হইবে।

পৃথিবীতে মনুষ্যসমাজে নানাবিষয়ে কঠিন ও গুরুতর সমস্যাসকল উপস্থিত। জাতিতে জাতিতে বিরোধ ও স্বার্থদ্বন্দ্ব, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ ও অনৈক্য, নরজাতি ও নারীজাতির মধ্যে অধিকার বৈষম্য, ধনে ও শ্রমে দ্বন্দ্ব। এই সকল দ্বন্দ্বে পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ সংগ্রামক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। এই বৈষম্যের যুগে মানুষ একের উপর অপরের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে যাইয়া পৃথিবীর দুঃখ ও অশান্তি বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। পৃথিবীর এই দুঃসময়ে জগৎপিতা পরমেশ্বর নূতন বিধানের মহাসমন্বয়ের ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন। এ ধর্ম্ম সর্ব্ববিধ বিরোধ নষ্ট করিয়া ধর্ম্মে ধর্ম্মে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, জ্ঞানে ভক্তিতে, জাতিতে জাতিতে, পুরুষে নারীতে মহাসমন্বয় ঘটাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এমন দিন আসিবে যখন এই ধর্ম্মের উচ্চতা ও ইহার সর্ব্ব-সমন্বয়কারী ভাব লোকে বুঝিতে পারিবে এবং ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য, শান্তির রাজ্য, কুশলের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইহা নিস্ফল হইবে না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরিশিষ্ট।

বংশাবলী।

আদি পুরুষ সদাশিব ঘোষ। সৌকালীন গোত্র। বংশধরগণের এক শাখা টাঙ্গাইলের অন্তর্গত মগরা গ্রামে বসতি করেন। ত্রিলোচন ঘোষ পর্য্যন্ত মগরায় ছিলেন। তাঁহার পৌত্র শিবপ্রসাদ ও রতিকান্ত এই দুই ভ্রাতা বীরসিংহ গ্রামে বাস আরম্ভ করেন।

- ত্রিলোচন ঘোষ
  - রামপ্রসাদ
    - শিবপ্রসাদ
      - কৃষ্ণপ্রসাদ
        - ভুবনময়ী
        - ঈশানচন্দ্র
      - গুরুপ্রসাদ
        - বৈকুণ্ঠনাথ
          - প্রেমলতা
            - বিনয়শেখর
            - করুণাশেখর
            - জ্যোৎস্নাময়ী
          - দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ
          - প্রীতিলতা
            - গৌতম
            - গায়ত্রী
            - সিদ্ধার্থ
          - যোগিনীবালা
            - সতীভূষণ
            - নীলিমা
            - রমা
            - খোকা
            - উমা
          - অমিয়াবালা
        - বামাসুন্দরী
        - নীলকণ্ঠ
        - রাইসুন্দরী
        - প্যারীসুন্দরী
        - যোগেন্দ্রনারায়ণ
    - রতিকান্ত
      - কালীপ্রসাদ
      - রামসুন্দর
      - উমাপ্রসাদ
      - অটলমণি

যে সকল স্থানে প্রচার উদ্দেশ্যে যাওয়া হইয়াছে, এবং কিছু কাজ করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলা

সেওরা, মুক্তাগাছা, বেগুনবাড়ী, পিয়ারপুর, সেরপুর, জামালপুর, কানিহারী, ধলা, রসুলপুর, সাল্‌টীয়া, বালীপাড়া, হোসেনপুর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ, জঙ্গলবাড়ী, দুলালপুর, হাতকাপাড়া, ভৈরববাজার, পিঙ্গনা, বীরসিংহ, সিহরাইল, টাঙ্গাইল, বাঘিল, অলোয়া, বেড়াবুচিনা, সন্তোষ, সাকরাইল, কাগমারী, বেলতা, করটীয়া, জামুর্কি, পাকুল্লা, কেদারপুর, নাগরপুর, এলাসিন, ইটনা, নন্দনপুর, স্থতি, প্রভৃতি।

ঢাকা জেলা

ঢাকার গলি গলি, নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, ফতুল্লা, কালীগঞ্জ, আমদিয়া, মাত্রা, পাঁচগাঁও, সাতগাও, পাঁচদোনা, ভাটপাড়া, মুন্সীগঞ্জ, দেওভোগ, কার্ত্তিক বারুণিমেলা, রেকাব বাজার।

বজ্রযোগিনী, সোণারঙ্গ, আউটসই, বাইগা, স্বর্ণগ্রাম, পয়সাগাঁও, বহর, ভরাকৈর, বালীগাঁও, তালতলা, মালখানগর, শ্রীনগর, হাসরা, ষোলঘর, ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ, ফুলবাড়ী, সাভার, মীরপুর, নবাবগঞ্জ, তেঘরিয়া, রোওয়াইল, রঘুনাথপুর, নান্নার, নওগাঁও, সুয়াপুর, আমতা, বেলেটী, তিল্লি, মাণিকগঞ্জ, মত্ত, বায়রা।

ফরিদপুর

ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, চৌদ্দরসী, মানিকদহ, ভাঙ্গা, মাদারীপুর, সন্দ্বীপ, জপ্‌সা, ভোজেশ্বর, কোমরপুর, পালঙ্গ।

বাখরগঞ্জ

বরিশাল, কাশীপুর, নলচিটি, ঝালকাটী, কাউখালী, পিরোজপুর, বাটাজোর, উজীরপুর।

ত্রিপুরা

কুমিল্লা, কালীকচ্ছ, নাছিরনগর, চুণ্টা, গুতাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কসবা, মুরাদনগর, লাক্‌সাম, পশ্চিমগাঁও, চৌদ্দগ্রাম, চাঁদপুর, আগড়তলা।

নোয়াখালী

নোয়াখালী, হরিনারায়ণপুর, লক্ষ্মীপুরা, ফেণী, দেওয়ানগঞ্জ।

চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ড, বাড়বকুণ্ড, লবণাক্ষ, মিরেশ্বরী রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার।

আসাম

শ্রীহট্ট, ছাতক, স্থনামগঞ্জ, টীলাঘর, সাঙ্গর, কাছাড়, বর্ণারপুর। ধুবরী, বিলাসীপাড়া, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, তেজপুর, ডিব্রুগড়, ডুমডুমা, দইধাম, বড়জুলী।

অন্যান্য স্থান

রঙ্গপুর, নিলফামারী, কুড়িগ্রাম, কাকিনা, পার্ব্বতীপুর, দিনাজপুর, ফুলবাড়ী, জলপাইগুড়ি, দেবীগঞ্জ, দিঘাপাতীয়া, কুমারখালি, চুয়াডাঙ্গা।

কলিকাতা, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, চুঁচুড়া, চন্দননগর, ধসা, বর্দ্ধমান, বোলপুর, ভাগলপুর, মুঙ্গের, মোকামা, দেরাদুন, আরা, পুরুলিয়া, রাঁচি, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ।

কুচবেহার, মেখলীগঞ্জ, হলদিবাড়ী, ফতেমামুদ, ফুলবাড়ী, দীন হাটা, আলীপুর, ঘুঘুমারী, বাণেশ্বর, খোলটা, স্থকটাবাড়ী, গোসাঞী-মারী, বামনহাট, চৌধুরী হাট, বড়মরিচা, শীতলখুচী, মাথাভাঙ্গা, নলঙ্গিবাড়ী, সিদ্ধিগঞ্জ, শীকারবাড়ী, পাটগ্রাম, ঘোড়ামারা।

দ্বারভাঙ্গা, তমলুক, কাঁথি, বালিয়া, মারীচদা, চণ্ডিভিটি, সামচক।

মেদিনীপুর, বালেশ্বর, সিন্ধিয়া, ময়ূরভঞ্জ, কটক, পুরী, গিরিধি, ছাপরা, কাশী, জামতাড়া।

BL 1235 Ghosh, Baikuntha
.5 Nath, 1854-1928.
.G42A3 Āmāra jībana
kathā